MA-09-BENG-4.4

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
M. A. in Bengali

চতুর্থ ষাণ্মাসিক

চতুর্থ পত্র (Paper : 4)
বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

বিভাগ - ১ : প্রা.ভা.আ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব, প্রাচীন-মধ্য-নব্য বাংলা ভাষার কালবিচার এবং ত্রি-স্তরীয় বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

বিভাগ - ২ : বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ এবং শব্দার্থ পরিবর্তনের ত্রিধারা, বাংলা উপভাষা, বাংলা চলিত বনাম সাধুভাষা

বিভাগ - ৩ : স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ, ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ ও সূত্র, ব্যঞ্জনব্যবহিত স্বরধ্বনি, সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি

বিভাগ - ৪ : প্রত্যয়, উপসর্গ, বচন, কারক ও বিভক্তি, কারকবাচক অনুসর্গ, সর্বনাম, যৌগিক ক্রিয়া, যৌগিক কাল, কৃদন্ত অতীত কাল

Contributor :

Ratnadip Purakayastha (Units: 1, 2, 3, 4, 5 & 6)	Dept. of Bengali Digboi Mahila Mahavidyalaya
Shantanu Roy Chowdhury (Units: 7 & 8)	Dept. of Bengali Pandu College, Guwahati

Course Co-ordination :

Prof. Kandarpa Das	Director, GUIDOL
Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University
Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University

Language Editing :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor, Department of Bengali Pandu College, Guwahati

Proof Reading :

Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University
Subhankar Das	Research Scholar Gauhati University

Format Editing :

Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Cover Page Design

Bhaskar Jyoti Goswami	GUIDOL

ISBN : 978-93-84018-77-1

May, 2015

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. Further information about the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University by Prof. Kandarpa Das, Director and printed at Maliyata Offset Press, Mirza, Copies printed 500.

Acknowledgement

The Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University duly acknowledges the financial assistance from the Distance Education Council, IGNOU, New Delhi for preparation of this material.

পত্র পরিচিতি

চতুর্থ যাণ্মাসিকের চতুর্থ পত্রে আপনাদের স্বাগত জানায়। এই পত্রের বিষয়বস্তু হল বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য [মূল সহায়ক গ্রন্থ — 'ভাষার ইতিবৃত্ত' : সুকুমার সেন।] এখন পর্যন্ত আমাদের বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বাংলা সাহিত্যের কৃতি লেখক, তাঁদের সাহিত্য কৃতি এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কিন্তু যে ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব তার ইতিহাস কিংবা নব্যভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে বাংলা অসমিয়া হিন্দি মারাঠি ইত্যাদি ভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের আর্যভাষার ধ্বনিতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্ব এবং সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে আমরা আমাদের পাঠক্রমের মাধ্যমে কোনো ধারণা লাভ করিনি। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত চতুর্থ পত্রের অধ্যয়ন আমাদের জ্ঞানের এই পরিধি প্রসারণে সহায়তা করবে।

ভারতবর্ষে সর্বমোট চারটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে (ক) ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan), (খ) দ্রাবিড় (Dravidian), (গ) অস্ট্রিক (Austric), (ঘ) ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese or Sino-Tibetian)। এর মধ্যে ভারতীয় আর্য ভাষা-ভাষী অধিবাসীর সংখ্যাই হচ্ছে সর্বাধিক। বস্তুত বাংলা অসমিয়া হিন্দি ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ফল। এই ক্রমবিবর্তনী ধারার মধ্যস্তরে আমরা পেয়েছি মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষা বা পালি এবং প্রাকৃত ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা আবার ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠী থেকে জাত একটি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠী। আমরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার থেকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি পর্যন্ত এই বিবর্তনী ধারাকে এভাবে দেখাতে পারি:

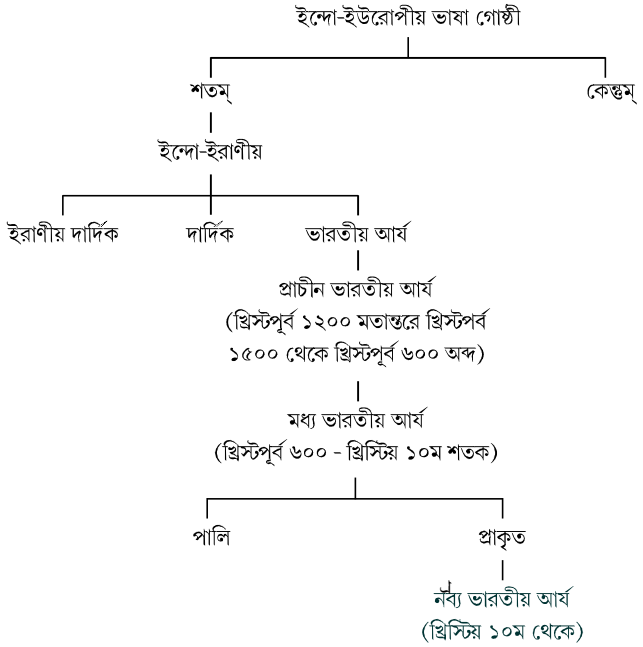

বক্ষ্যমাণ পত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাংলা ভাষার উদ্ভব, প্রাচীন-মধ্য-নব্য বাংলা ভাষার কালবিচার এবং ত্রি-স্তরীয় বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। তারপর বাংলা শব্দভাণ্ডার, শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ, শব্দার্থ পরিবর্তনের ত্রি-ধারা, বাংলা উপভাষা, বাংলা চলিত বনাম সাধুভাষা প্রভৃতির আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরপর রয়েছে — স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণি-বিভাগ, ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ ও সূত্র, ব্যঞ্জনব্যবহিত স্বরধ্বনি, সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি প্রভৃতির আলোচনা। সবশেষে আলোচিত হয়েছে— প্রত্যয়, উপসর্গ, বচন, লিঙ্গ, কারক ও বিভক্তি, কারকবাচক অনুসর্গ সর্বনাম, যৌগিক ক্রিয়া, যৌগিক কাল, কৃতন্ত অতীত কাল ইত্যাদি। আসুন, আমাদের পাঠ্য বিষয়ের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক্ —

বিভাগ - ১ : প্রা.ভা.আ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব, প্রাচীন-মধ্য-নব্য বাংলা ভাষার কালবিচার এবং ত্রি-স্তরীয় বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

বিভাগ - ২ : বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ এবং শব্দার্থ পরিবর্তনের ত্রিধারা, বাংলা উপভাষা, বাংলা চলিত বনাম সাধুভাষা।

বিভাগ - ৩ : স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ, ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ ও সূত্র, ব্যঞ্জনব্যবহিত স্বরধ্বনি, সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি।

বিভাগ - ৪ : প্রত্যয়, উপসর্গ, বচন, কারক ও বিভক্তি, কারকবাচক অনুসর্গ, সর্বনাম, যৌগিক ক্রিয়া, যৌগিক কাল, কৃদন্ত অতীত কাল।

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, তবু সাধারণভাবে এগুলিকে কিছু বিষয়ের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাই, আমরা আশা করব আপনাদের জ্ঞানানুসন্ধান এই উপকরণসমূহের বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং আপনাদের নিজস্ব এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রত্যেক বিভাগেই এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি প্রসঙ্গ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, — মূল গ্রন্থ পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া, মূল গ্রন্থগুলির পাঠ, অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে বলে অনিচ্ছাকৃত ভুল তথা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই সচেতন শিক্ষার্থী এই বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে বা সরাসরি অবগত করালে আমরা কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। বিশেষ কারণ-বশত দু-একটা উপকরণ এই পত্রে সংযোজিত করা গেল না। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংযোজন করব। আশা করি, আমাদের এই আয়োজন ও প্রচেষ্টা আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

বিভাগ পরিচিত

চতুর্থ যাণ্মাসিকের চতুর্থ পত্রের বিভাগ পরিচিতিতে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রের মূল বিষয়বস্তু হল — বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য। আসুন, এই পত্রের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক্ —

বিভাগ - ১ : বাংলা ভাষা : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বিভাগ - ২ : মগধীয় ভাষাগুচ্ছ : উৎপত্তি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বাংলা-সহ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

বিভাগ - ৩ : বাংলা শব্দভাণ্ডার

বিভাগ - ৪ : শব্দার্থতত্ত্ব ও শব্দার্থ পরিবর্তন

বিভাগ - ৫ : বাংলা উপভাষা

বিভাগ - ৬ : বাংলা ভাষা : ধ্বনি সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহ

বিভাগ - ৭ : কারক ও বিভক্তি, কারক বাচক অনুসর্গ

বিভাগ - ৮ : উপসর্গ প্রত্যয়, বাংলা উপসর্গ, লিঙ্গ, ক্রিয়ার কাল ও ধাতু

বিভাগ-১

বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষা : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.২ বাংলা ভাষার উৎপত্তি

  ১.২.১ প্রাচীন ভারতীয় আর্য

  ১.২.২ মধ্য ভারতীয় আর্য

  ১.২.৩ নব্য ভারতীয় আর্য

১.৩ বাংলা ভাষা

  ১.৩.১ বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

১.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১.৫ প্রাসঙ্গিক টীক (Summing Up)

১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

বহুজাতি, বহুভাষা ও বহুবর্ণের সমন্বয়ে জম্বুদ্বীপের ইতিহাসতৈরি হয়েছে। ভারতবর্ষে আধুনিক কালের অধিকাংশ ভাষাগুলিই পৃথিবীর অসংখ্য ভাষার আদিমূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর নয়টি ভাগের অন্যতম ইন্দো-ইরানীয় ভাষা থেকে উদ্ভুত। ইন্দো-ইরানীয় ভাষা সময়ের টানে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়-- ইরানীয়, দরদীয় ও ভারতীয় আর্য। ইরান থেকে খাইবার গিরিপথ হয়ে আর্যদের ভারতবর্ষে আগমন, অনার্য ভাষাগেষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাত ও বিজয় এবং উত্তরাপথে আর্যাবর্ত প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতীয় আর্যভাষার যাত্রারম্ভ।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষা বংশ থেকে জাত আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীর বহু অঞ্চলে দুই বিশাল মহাদেশ ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকাংশে প্রচলিত আছে। শুধু ভৌগোলিক বিস্তারে নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও এই ভাষাবংশ থেকে জাত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এই ভাষাবংশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা। বৈদিক সংহিতার সূক্ত, সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি ব্যাস ও বাল্মীকির

'মহাভারত' ও 'রামায়ণ'। কালিদাসের কাব্য-নাটক সমূহ, গ্রিক মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড', 'অডিসি', লাতিন কবি ভার্জিলের 'ইনিড' ইত্যাদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে জাত ভাষা সমূহের প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি। এই বংশের আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, বাংলা ইত্যাদি ভাষা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথিবীজোড়া সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই সমস্ত ভাষার কবি সাহিত্যিকগণ যেমন ইংরেজ কবি-নাট্যকার শেক্সপিয়র, জার্মান কবি-নাট্যকার গ্যেটে, কবি রিল্‌কে, ফরাসি সাহিত্যিক ভল্‌তেয়ার, মালার্মে, ভলেরি, ইতালীয় কবি পেত্রার্ক, দান্তে, নন্দনতত্ত্ববিদ ক্রোচে, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান এখন কোনো ভাষাবিশেষের বা ভাষাবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলি এখন সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেরই সম্পদ হিসাবে পরিচিত।

এই ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশই বাংলা ভাষার আদি উৎস। কিন্তু এই আদি উৎস থেকে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করে বাংলা ভাষা জন্ম লাভ করেছে।

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বিষয়ক আলোচনার বর্তমান প্রসঙ্গকে আমরা প্রথম বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই বিভাগে আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশ। বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের আলোচনাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যাতে ---

- আপনারা বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসের ধারাবাহিক একটা রূপরেখা অনুসরণ করতে পারবেন।
- ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মধ্যকালীন বিভিন্ন স্তরগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

১.২ বাংলা ভাষার উৎপত্তি

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের আদি বাসস্থান দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরতে শুরু করে। এই বিস্তারের ফলে তাদের

ভাষায় ক্রমশআঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধি হয় এবং মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে নয়টি প্রাচীন ভাষা বা শাখার জন্ম হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর এই প্রাচীন নয়টি শাখা হল -- (১) কেলটিক (Celtic); (২) ইটালিক (Italic); (৩) জার্মানিক (Germanic) বা টিউটনিক (Teutonic); (৪) গ্রিক (Greek); (৫) বাল্‌তো-স্লাবিক (Balto-Slavic); (৬) আলবানীয়(Albanian); (৭) আর্মেনীয (Armenian); (৮) তোখারীয় (Tokharian) এবং (৯) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) বা আর্য (Aryan)

এই শাখাগুলির মধ্যে শুধু ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করত এবং গৌরব অনুভব করত বলে সংকীর্ণ অর্থে অনেকে ইন্দো-ইরানীয় শাখাটিকে 'আর্য' শাখা বলে মনে করেন, যদিও ব্যাপক অর্থে সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকেই আর্য ভাষাবংশ বলে অভিহিত করা হয়। ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি উপ-শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় — ইরানীয় (Iranian) ও ভারতীয়-আর্য (Indo-Aryan)। ইরানীয় উপশাখাটি ইরান-পারস্যে চলে যায়। এই শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তায়' (খ্রি.পূ. অষ্টম শতাব্দী) ও হখামেনীয় সম্রাটদের প্রাচীন প্রত্নলিপিতে। অন্য শাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই শাখাটিই ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে এই আর্যভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। তখন থেকে ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসের সূচনা। অদ্যাবধি এই আর্য ভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করে চলেছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

আর্যশাখার ধ্বনিগত প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই দুটি --

(ক) মূল ভাষার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ (অ, এ, ও) যথাক্রমে (অ) এবং (আ) ধ্বনিতে পরিণত। মূল ভাষার অতি হ্রস্ব (অ) ই-কারে পরিণত।

(খ) হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ-কার এবং ঈ-কারের পরবর্তী কণ্ঠ্য ও কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্য বর্গের ধ্বনি চ-বর্গীয় ধ্বনিতে পরিণত। যেমন- * ক্ক>সং. চ, আ. চ, পা. চা। *গ্বীবোস>সং. জীবস, প্রা.পা. জীব ইত্যাদি। এই ধ্বনিপরিবর্তন কোলিৎজ প্রথম লক্ষ করেছিলেন।

আর্য শাখার প্রধান উপশাখা দুটি --- ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য।

প্রবীণ ভাশষাতত্ত্ববিদগণ আর্যশাখার ইরানীয় এবং ভারতীয় আর্য উপশাখার মধ্যবর্তী দরদীয় (Dardic) নামে একটি তৃতীয় উপশাখা কল্পনা করেছেন। এই কল্পিত উপশাখার ভাষাগুলির মধ্যে ইরানীয় ও ভারতীয় উভয় শাখারই কিছু কিছু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। তথাকথিত দরদীয় ভাষাগুলি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুকুশে এবং পামির উপত্যকায় প্রচলিত রয়েছে। এই ভাষাগুলির অন্যতম হচ্ছে কাশ্মীরি।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে কীভাবে ভারতীয় আর্যের উৎপত্তি হয়েছে? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন শাখাগুলি কী কী? (৩০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

ইন্দো-ইউরোপীয় শাখাকে আর্যশাখা বলার কারণ কী? (৩০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগে থেকে যিশুখ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দুহাজার বছর পর্যন্ত ভারতীয় আর্যভাষার এই সাড়েতিন হাজার বছরের ইতিহাসকে বিবর্তনের স্তর ভেদে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan = OIA) : প্রাচীন ভারতীয় আর্যের সময়সীমা আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত। এই যুগের আর্য ভাষার নাম দেওয়া যেতে পারে বৈদিক ভাষা বা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত ভাষা। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঋগ্বেদ সংহিতা।

(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA) : আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে খিস্টীয় দশম শতক পর্যন্ত এই স্তরের বিস্তৃতি। এই যুগের আর্য ভাষার নাম পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ। অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, জৈন ধর্মগ্রন্থে ও কিছু স্বতন্ত্র রচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত, বৌদ্ধ ধমগ্রন্থে ব্যবহৃত পালিভাষা এযুগের ভাষার নিদর্শন।

(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA) : এই স্তরের যাত্রারম্ভ আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দে, যা অদ্যাবধি প্রবহমান। বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার নাম — বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, পঞ্জাবি ইত্যাদি। নানা সাহিত্যগ্রন্থ এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষাই এই স্তরের নিদর্শন।

বস্তুত একই ভারতীয় আর্য ভাষা বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়ে পৃথক রূপলাভ করেছে, তাই প্রত্যেক যুগে পৃথক নামকরণের মাধ্যমে তা চিহ্নিত করতে হয়েছে। প্রত্যেক যুগের ভাষাগত নিদর্শন ও ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য রচনায়, প্রত্নলিপিতে পাওয়া গেছে। ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন যুগের কালগত সীমা, যুগগত নাম ও নিদর্শন আমরা এভাবে উপস্থাপিত করতে পারি। —

যুগ	**কালগত সীমা**	**যুগগত নাম**	**নিদর্শন**
১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য Old Indo-Aryan = OIA	আঃ ১৫০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৬০০ খ্রিঃপূঃ পর্যন্ত	বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা	বেদ, মূলত ঋগ্বেদের সংহিতা (মন্ত্র) অংশ
২) মধ্য ভারতীয় আর্য Middle Indo-Aryan = MIA	আঃ ৬০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ১০০০ খ্রিঃ পর্যন্ত	প্রকৃত ভাষা, পালি ভাষা	অশোকের শিলালিপি, সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণির পুরুষ চরিত্রের সংলাপ, প্রাকৃতে ও পালি ভাষায় রচিত যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্যাদি সাহিত্যগ্রন্থ ইত্যাদি,
		ক্লাসিক্যাল বা লৌকিক সংস্কৃত ভাষা	কালিদাস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সংস্কৃত কাব্য নাটকাদি
৩) নব্য ভারতীয় আর্য New Indo-Aryan = NIA :	আঃ ১০০০ খ্রিঃ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত	বাংলা, হিন্দি, অবধি, মারাঠি, পঞ্জাবি ইত্যাদি	আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা ও সাহিত্য

১.২.১ প্রাচীন ভারতীয় আর্য

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার আনুমানিক বিস্তৃতি ১৫০০ খ্রিঃপূঃ পর্যন্ত। হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এ এই যুগের ভারতীয় আর্য ভাষার মূল নিদর্শন প্রাপ্ত হয়েছে। বেদ চারটি — ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি অংশ — সংহিতা (মূল মন্ত্রভাগ), ব্রাহ্মণ (যজ্ঞানুষ্ঠানের গদ্যাত্মক বিধিবিধান ও কিছু ব্যাখ্যা তথা কিছু আখ্যান উপাখ্যান) উপনিষদ (গদ্য ও পদ্যে রচিত মূল আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব) এবং আরণ্যক (গূঢ়তর দার্শনিক তত্ত্ব ও কিছু আখ্যান উপাখ্যান)। এইগুলির মধ্যে ঋগ্বেদের সংহিতা অংশটি সবচেয়ে প্রাচীন। ঋগ্বেদ সংহিতাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নির্ভরযোগ্য ও প্রামানিক নিদর্শন।

চলমান ভাষা মাত্রেই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাও লোকমুখে স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল। কিন্তু বেদের ভাষাকে এদেশের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহকগণ 'দেবভাষা' বলে বিশ্বাস করতেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এই ভাষা যে পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল তাকে তাঁরা দেবভাষার বিকৃতি বলে বিবেচনা করলেন এবং বিকৃতি রোধের জন্য ব্যাকরণ রচনা করতে আরম্ভ করলেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে, মানুষকে মূল ভাষার ব্যাকরণে শিক্ষিত করলে সে শুদ্ধ 'দেবভাষা'য় কথা বলবে এবং এতে ভাষার বিকৃতি বন্ধ হবে। এইভাবে তাঁরা ব্যাকরণের নিয়মের মাধ্যমে ভারতীয় আর্য ভাষার শুদ্ধ মার্জিত রূপের যে আদর্শ রচনা করলেন তারই নাম সংস্কৃত ভাষা।

যারা এই সংস্কৃত ভাষার ব্যকরণ রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মহামনীষী পাণিনি। মূলত পাণিনি কর্তৃক মার্জিত এই সংস্কৃতই সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃত ভাষা যা সাধারণত ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত বা লৌকিক সংস্কৃত নামে পরিচিত।

অশ্বঘোষ থেকে শুরু করে কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, বাণভট্ট প্রমুখ কবি ও নাট্যরকারদের রচনায় এই সংস্কৃত ভাষার নিদর্শন রয়েছে। এই ভাষা ছিল প্রধানত শিক্ষিত লোকের ভাববিনিময়ের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা। বৈদিক ভাষা ছিল বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের জীবন্ত ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত পরবর্তী কালের অঞ্চল বিশেষের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের সাধুভাষা।এই ভাষা বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা থেকে ছিল অনেক দূরবর্তীএবং সেই অর্থে এই ভাষা অংশত এক কৃত্রিম ভাষা। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত যখন সাহিত্যের ভাষারূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল 'প্রাকৃত ভাষা'। জনসাধারণের জীবন্ত ভাষাস্রোত থেকে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ক্রমে যত বিচ্ছিন্ন হয়েছে ততই তা ব্যাকরণের গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে আরো কৃত্রিম হয়ে পড়েছে এবং শেষপর্যন্ত 'মৃতভাষা'য় পরিণত হয়েছে। যদিও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ভাষার বিস্তৃতিকাল মূলত মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগেরই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ভাষার গঠন ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এতে প্রাকৃতের চেয়ে বৈদিক ভাষার উত্তরাধিকারই বেশি। তাই ভাষাগত

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতকে ব্যাপক অর্থে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংস্কৃত ভাষা কথাটি এখন সাধারণত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, এর মধ্যে বৈদিক ভাষা ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে হলে 'বৈদিক সংস্কৃত' ও 'ক্লাসিক্যাল (বা লৌকিক) সংস্কৃত' নাম দুটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা হয়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা বলিতে বোঝায় সেই পুরাতন ভাষা যাহার সাধু রূপ দুইটি — বৈদিক ও সংস্কৃত। (এখানে মনে রাখিতে হইবে যে বৈদিক ও সংস্কৃত কোনোটিই ঠিক কথ্য অর্থাৎ মুখের ভাষা ছিল না, দুইই ছিল সাহিত্যের ভাষা অর্থাৎ পোষাকি ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বলিলে বৈদিক ও সংস্কৃতের পিছনে যে কথ্য ভাষা ছিল তাহাই বুঝিতে হইবে।) বৈদিক ও সংস্কৃত মোটামুটি অভিন্ন হইলেও দুইটির মধ্যে কিছু মৌলিক এবং প্রচুর কালপরিমাণগত পার্থক্য আছে। সংস্কৃতের মধ্যে ভারতীয়-আর্য ভাষার পরবর্তী (অর্থাৎ মধ্য বা "প্রাকৃত") স্তরের অনেক শব্দ ও বাক্‌রীতি প্রবেশ করিয়াছে। এগুলিকে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করা চলেনা। সুতরাং সংস্কৃত এবং প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা সর্বদা সমার্থক নয়। তেমনি প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা বলিতে শুধু বৈদিকই বোঝায় না। কেননা এমন অনেক পুরানো পদ ও প্রয়োগ সংস্কৃতে আছে যাহার মূল বৈদিক ভাষায় মিলে না।"

(ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন)

বৈদিক যুগের আর্য ভাষাই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অবিমিশ্র অবিকৃত নিদর্শন। এই বৈদিক যুগের আর্য ভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ---

(ক) ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ প্রভৃতি স্বরধ্বনি এবং শ, ষ, স প্রভৃতি ব্যঞ্জন ধ্বনি বৈদিক ভাষায় প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে এই সমস্ত স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে বা লুপ্ত হয়েছে।

(খ) স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তরগত স্বরধ্বনির বিশেষ ক্রম অনুসারে গুণগত পরিবর্তন হত।

(গ) সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে সন্ধি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল।

(ঘ) বিভিন্ন যুক্ত ব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

(ঙ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি বচন প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রচলিত ছিল।

(চ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাতেও আটটি কারক, তিন প্রকার লিঙ্গ বর্তমান ছিল।

(ছ) শব্দরূপের তুলনায় ক্রিয়ারূপে বৈচিত্র্য প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় অনেক বেশি ছিল। দুই বাচ্যে ক্রিয়ার পৃথক পৃথক রূপ হত।

(জ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়ার পাঁচটি কাল প্রচলিত ছিল।

(ঝ) প্রত্যয়-যোগে প্রচুর নতুন শব্দ গঠন প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(ঞ) বৈদিকে ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু অসমাপিকা ক্রিয়া রচনা করা হত।

তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় z, zh, ź, zh́ ইত্যাদি উষ্মধ্বনির ব্যবহার বৈদিকে দেখা গেল না।

ব্যাকরণানুসারী ভাষা হিসাবে অনুশাসনের নিগড়ে বন্দী সংস্কৃত ভাষা একটা জায়গায় থেমে থাকলেও সময়ের টানে ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের পরিবর্তনকে বৈদিক ভাষা এড়াতে পারল না। খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা ভেঙে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার উদ্ভব, যে ভাষা খ্রিস্টীয় দশম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'সংস্কৃত' ভাষা বলতে কী বোঝায়? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

বৈদিক এবং প্রাকৃত এই উভয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধ কী? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

১.২.২ মধ্য ভারতীয় আর্য

ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময় থেকে ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিগত তথা ব্যাকরণগত স্বরূপ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিক-সংস্কৃত থেকে পৃথক হয়ে গেল। এই সময় থেকে ভারতীয় আর্য ভাষার অন্য এক যুগের সূচনা হল। এই যুগই মধ্যভারতীয় আর্য (MIA) ভাষার যুগ হিসাবে পরিচিত। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার যুগগত সাধারণ নাম 'প্রাকৃত ভাষা'। প্রাকৃত ভাষার বিখ্যাত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্রের মতে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ হলে মূল উপাদান। ভারতীয় আর্য ভাষার ক্ষেত্রে এই মূল উপাদান হল বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। এই মূল উপাদান থেকে যে ভাষার জন্ম তা-ই 'প্রাকৃত ভাষা'। বৈদিক সংস্কৃতের পরে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত যখন জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুষ্ঠিমেয় শিক্ষিত লোকের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন জনসাধারণর মুখের ভাষা রূপে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন 'প্রাকৃত ' নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন "প্রাকৃত বা প্রাকৃত ভাষা কথাটির আসল তাৎপর্য হইতেছে 'প্রকৃতির অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা।"

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ব্যাপ্তিকাল আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃপূঃ থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতক পর্যন্ত। এই পর্বের প্রধান ভাষা হল প্রাকৃত ভাষা। তাছাড়া ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত, বৌদ্ধ সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত এবং পালি ভাষাও মূলত এই যুগের অন্তরগত। প্রায় দেড় হাজার বৎসর ব্যাপ্তিকালের মধ্যে মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তনের সূত্র অনুসরণ করে মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসকে বিভিন্ন উপপর্বে বা সুরে ভাগ করা হয়েছে। আবার আর্যগণ ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার অব্যবহিত ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁদের ভাষার ভৌগোলিক কিছুটা আঞ্চলিক এবং বিভিন্ন অঞ্চলভেদে ভাষার কিছুটা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও গড়ে উঠেছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই সমস্ত আঞ্চলিক রূপ বা আঞ্চলিক উপভাষাকে পৃথক পৃথক 'প্রাকৃত' হিসাবে অভিহিত করেছেন।

ভাষাবিবর্তনের বিচারে মধ্যভারতীয় আর্য ভাষাকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিঃপূ দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত এর আদিস্তর, খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত এই ভাষার ক্রান্তিকাল, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত মধ্যস্তর এবং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে দশম শতক পর্যন্ত এই ভাষার

অন্ত্যস্তরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্রান্তিকাল বা অন্তর্বর্তীকালকে এক সময়ে বন্ধ্যাকাল বলে মনে করা হলেও এ যুগের কিছু রচনার নিদর্শন পরবর্তী যুগে পাওয়া গেছে।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার তথা প্রাকৃতের প্রথম স্তরে (খ্রিঃপূঃ ৬০০ - খ্রিঃপূঃ ২০০) বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। অশোকের শিলালিপিতে (খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতক) মধ্য ভারতীয় আর্যের মূল স্তরের উপভাষা চারটির পরিচয় পাওয়া গেছে- (১) উত্তর-পশ্চিমা (শাহবাজগঢ়ী ও মানসেহ্‌রা অনুশাসন), (২) দক্ষিণ-পশ্চিমা (গির্নার অনুশাসন) (৩) প্রাচ্যমধ্য (কালসী ও ছোটো অনুশাসন গুলি) এবং (৪) প্রাচ্য (ধোলী ও জোগঢ় অনুশাসন)। উত্তর প্রদেশের গোগীমারা গুহায় 'সুতনুকা' (শুতনুকা) নামে যে অশোকের সমকালীন প্রত্নলিপিটি পাওয়া গেছে (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) তা প্রাচ্যর অনুরূপ নয়, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'পূর্বীপ্রাচ্যা'। এই আদি স্তরের ভাষাসমূহ জনগণের উদ্দেশ্যে রচিত। এগুলি তৎকালে প্রচলিত কথ্যভাষা ছিল বলেই অনুমান করা হয়। এগুলি ছাড়াও এই সময়কালের মধ্যে হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের রচিত গ্রন্থে চপালিভাষা' ব্যবহৃত হয়েছে এবং মহাযান পন্থী বৌদ্ধগণ মিশ্র সংস্কৃত' ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই ভাষা দুটিও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

ক্রান্তিপর্বে (খ্রিঃ পূঃ ২০০- খ্রিস্টীয় ২০০ অক) রচিত কিছু সাহিত্যিক নির্দশন মধ্য এশিয়ার খোটানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত 'খোটানী সম্পদ' (খ্রিঃ পূঃ ১০০ - খ্রিস্টীয় ১০০ অব্দ) পাওয়া গেছে এবং চিনা তুকিস্থানে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত 'নিয়া প্রাকৃত'-এর কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই প্রাকৃতগুলিকেই বৈয়াকরণগণ সম্ভবত 'গান্ধরী প্রাকৃত' নামে অভিহিত করেছেন। প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্যিক রূপ হিসাবে শৌরসেনী অপভ্রংশ ও শৌরসেনী অবহট্‌ঠকে পাওয়া গেছে। শৌরসেনী অবহট্‌উঠ একসময়ে সমগ্র উত্তর ভারতে শিষ্টজনসম্মত সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল। শৌরসেনী ব্যতীত অন্য কোনো অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের নিদর্শন পাওয়া না গেলেও ভাষার জ্ঞানীগণ এর সমান্তরাল ভাবে অর্ধমাগধী অপভ্রংশ এবং মাগধী অপভ্রংশের কল্পনা করে থাকেন। তবে প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ ওই পর্বে 'দেশীয়' বা 'লৌকিক' নামে যে ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত ওই দেশীয় ভাষাই ছিল সেই পর্বের কথ্যভাষা। যা থেকে পরবর্তী স্তরে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের উদ্ভব হয়েছে।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনি 'ঋনঃ ও'৯'মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল না ।

(খ) 'ঐ' এবং 'ঔ' যৌগিক স্বর দুটি একক স্বরে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' তে রূপান্তরিত হল।

(গ) 'অয়' এবং 'অব' সংকোচনের ফলে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' স্বরধ্বনিতে পরিণত হল।

(ঘ) পদের শেষে অবস্থিত অনুস্বার সাধারণত রক্ষিত হয়েছে, তাছাড়া পদান্তে স্থিত বাকি সব ব্যঞ্জন ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে।

(ঙ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের তিনটি শিষধ্বনির সবগুলিই কোনো প্রাকৃতে রক্ষিত হয়নি, তিনটির স্থলে একটি মাত্র শিষ ধ্বনির ব্যবহার প্রচালিত ছিল।

(চ) ঋ, র, ষ ধ্বনির পরবর্তী দন্ত্যধ্বনি (ত,থ, দ,ধ,ন) পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ধ্বনির (ট,ঠ,ড,ঢ,ণ) রূপ লাভ করেছে।

(ছ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে শব্দের অন্তে স্থিত ধ্বনির পার্থক্য অনুসারে শব্দরূপ পৃথক হত। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় সাধারণত আ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দ ছাড়া বাকি সমস্ত শব্দের রূপ অ-কারান্ত শব্দের মতো হত।

(জ) মধ্য ভারতীয় আর্যে দ্বি-বচন লুপ্ত হওয়ার ফলে শব্দরূপে শুধু একবচন ও বহু বচনের রূপভেদ বজায় থাকল, দ্বি-বচনের স্থানে বহুবচনের রূপ ব্যবহৃত হল।

(ঝ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ক্রিয়ারূপে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ দুই প্রকার ভেদ ছিল। মধ্য ভারতীয় আর্য আত্মনেপদ লুপ্ত হল, প্রায় সর্বক্ষেত্রে পরস্মৈপদের ব্যবহার প্রচলিত হল।

(ঞ) কোনো কোনো বিভক্তি লুপ্ত হওঁয়ার ফলে বিভক্তির অর্থে কিছু কিছু স্বতন্ত্র শব্দ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রচলিত হল এবং অনুসর্গের প্রচলন হল।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'প্রাকৃত' ভাষা বলতে কী বোঝায়? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করা যায়? এই স্তরগুলির বিভিন্ন নিদর্শন সমূহের পরিচয় দিন। (২০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

১.২.৩ নব্য ভারতীয় আর্য

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অপভ্রষ্ট, অর্থাৎ অবচীন অপভ্রংশ। এই ভাষাগুলি বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলে কালগত ও স্থাননিবদ্ধ রূপান্তর লাভ করে বাংলা, হিন্দি, পঞ্জাবি, সিন্দি, মারাঠি প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পরিণত হল। ঠিক একই সময়ে না হলেও, মোটামুটিভাবে বলা চলে যে অপভ্রষ্ট থেকে আধুনিক ভাষাগুলির উদ্ভব দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা হল ভারতে প্রচলিত আর্য ভাষার বিবর্তনের তৃতীয় রূপ। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলতে কোনো একটি বিশেষ ভাষাকে বোঝায় না । আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতকের সমকালীন সময়ে ভারতে আর্য শাখা থেকে যে সব নবীন ভাষার জন্ম হয় সেগুলিই নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা। বস্তুত নব্য ভারতীয় আর্য হল ইতিহাসের একটি পর্বের নাম। আর এই পর্বের ভারতীয় ভাষাগুলি হল বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, পঞ্জাবি ইত্যাদি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক নাগাদ সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষাগুলি রূপান্তরিত হয়ে যে ভাষার জন্ম দিয়েছিল সেই সরলীকৃত প্রাকৃত ভাষাসমূহকে বিভিন্ন প্রাকৃতের অপভ্রংশ রূপে পণ্ডিতগণ চিহ্নত করেছেন। এই অপভ্রংশ ভাষাগুলি থেকেই খ্রিস্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছে। মাগধী অপভ্রংশকে অঞ্চলভেদে পূর্বী ও পশ্চিমা এই দুই ভাগ ভাগ করা হয়েছে। আনুমানিক দশম শতকে পূর্বী মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা, অসমিয়া ও ওড়িয়া এবং পশ্চিমা মাগধী থেকে ভোজপুরী, মৈথিলি এবং মগধী এই ভাষাগুলির জন্ম হয়। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় যে অঞ্চলিক রূপভেদ গড়ে উঠিছিল তার বিবর্তনেই পরবর্তী স্তরে আরো আঞ্চলিক রূপভেদ গড়ে ওঠে এবং নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি তারই অপরিহার্য স্বাভাবিক পরিণতি। মধ্য ভারতীয় আর্যের একেকটি অঞ্চলিক রূপ থেকেই পরবর্তীকালের নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির একেকটি গোষ্ঠী বা ঐতিহাসিক শ্রেণি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রাকৃত থেকে যেমন বিভিন্ন অপভ্রংশ-অবহট্ঠের জন্ম হয়েছিল তেমনই সেই সব অপভ্রংশ- অবহট্ঠে র প্রত্যেকটি থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হয়েছে।

মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ- অবট্ঠর থেকে মারাঠি ও কোঙ্কাণী এই দুটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হয়েছে। পশ্চিমা বা দক্ষিণ পশ্চিমার উত্তর ভারতীয় শাখা থেকে শৌরসেনী প্রাকৃতের জন্ম। এই প্রাকৃত থেকে জাত শৌরসেনী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত— পাহাড়ি শাখা, মধ্য দেশীয় শাখা এবং পশ্চিমা শাখা। পাহাড়ি শাখা থেকে তিনটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা জন্ম নিয়েছে নেপালি, কুমায়ুনি ও গাড়ায়ালি। মধ্য দেশীয় শাখা থেকে পাঁচটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হয়েছে— কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজি, বুন্দেলী ও কঙ্গরু। শৌরসেনী অপভ্রংশের পশ্চিমা ভারতীয় শাখা থেকে গুজরাটি ও রাজস্থানী এই দুটি ভাষার জন্ম হয়েছে। মধ্য দেশীয় শাখা থেকে যে পাঁচটি ভাষার জন্ম হয়েছে সেগুলিকে একত্রে পশ্চিমা হিন্দি বলা হয়। অর্ধ-মাগধী

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে তিনটি নব্যভারতীয় আর্য ভাষা আবির্ভূত হয়েছে- অবধী, বাঘেলী ও ছত্তিশগড়ী। এই তিনটি ভাষাকে একত্রে পূর্বী হিন্দি বলা হয়। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মাগধী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি দুটি শাখায় বিভক্ত— পশ্চিমা শাখা ও পূর্বী শাখা। পশ্চিমা শাখা থেকে জন্ম হয়েছে তিনটি আধুনিক ভাষার— মৈথিলি, মগহী ও ভোজপুরী। পূর্বী শাখা থেকে প্রথমে ওড়িয়া এবং বঙ্গ-অসমিয়া এই দুটি আধুনিক ভাষার জন্ম হয়। বঙ্গ-অসমিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বাংলা ও অসমিয়া এই দুটি ভাষার জন্ম দেয়। পৈশাচী অপভ্রংশ- অবহট্‌ঠ থেকে প্রথমে দুটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হয় — সিন্ধি ও পঞ্জাবী। পঞ্জাবী পরে পূর্বী-পঞ্জাবী ও পশ্চিমা-পঞ্জবী নামে দুটি রূপ লাভ করে।

বিবর্তনের ধারায় ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি কালগত বিচারে যে নব্য ভারতীয় আর্য পর্বে পদার্পণ করল, সেই পর্বের নবীনতার কিছু সাধারণ লক্ষণ বর্তমান। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার এই সমস্ত সাধারণ লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ-

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সমীভবনের নিয়মে সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। এই সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় লুপ্ত হল এবং এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববতী স্বর দীর্ঘ হল। যেমন- নৃত্য >নচ্চ > নাচ (বাংলা)।

(খ) যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে আদিস্থিত নাসিক্যব্যঞ্জন লুপ্ত হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে আনুনাসিক স্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন- দন্ত) দাঁত (বাংলা, হিন্দি)।

(গ) পদের অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। ওড়িয়াতে অনেক বাংলা অচলা পদান্তিক স্বরধ্বনি রক্ষিত।

(ঘ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রত্যেক কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল এবং শব্দের সঙ্গে এই সব বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে প্রায় প্রত্যেক কারকে শব্দের স্বতন্ত্র রূপ হত। কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যে এই বিভক্তি গুলি প্রায় সবই লুপ্ত হল। মাত্র দুয়েকটি প্রাচীন বিভাক্তির পরিবর্তিত রূপ রক্ষিত হল। অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তির অর্থ প্রকাশের জন্য নতুন প্রত্যয়, প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ ও অনুসর্গের ব্যবহার প্রচলিত হল।

(ঙ) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়ারূপে সরলীকরণ হয়েছে খুব বেশি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব ও পাঁচটি কালে পৃথক রূপ ছিল, নব্য ভারতীয় আর্যে শুধু কর্তৃবাচ্য ও কর্মভাব বাচ্যে বর্তমানের বিভক্তি গঠিত রূপ-স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে, আর ভারের মধ্যে বর্তমান কালে নির্দেশক ও অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র রূপ আছে। অতীত কাল এবং ভবিষ্যৎ কালের রূপ গঠিত হয় যথাক্রমে নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয় যোগে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলতে কী বোঝায়?(১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন। (২০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১.৩ বাংলা ভাষা

আমাদের আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে আনুমানিক দশম শতকে পূর্বী মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া; পশ্চিমা মাগধী থেকে ভোজপুরী, মৈথিলি ও মগহী ভাষাসমূহের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করে পণ্ডিতগণ তিনটি সুস্পষ্ট স্তর চিহ্নিত করেছেন — প্রাচীন বাংলা (খ্রিস্টীয় ৯০০ — ১২০০ অব্দ), মধ্য বাংলা (১২০০ — ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ), আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ বর্তমানের ভাষা)। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সহজ সাধনার ইঙ্গিত সমান্বিত চর্যাগানগুলি প্রাচীন বাংলার নিদর্শন। এই ভাষা অপভ্রংশের খুব কাছাকাছি, শব্দ ও ধাতুরূপে মধ্যভারতীয় আর্যের অনুসারী। পরবর্তী সৃষ্টি মধ্যবাংলার প্রথম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। ষোড়শ শতকের লাচাড়ি প্রবন্ধের ভাষা প্রায় একালের মতোই। ঊনবিংশ শতক থেকে বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাতের ফলে গত দুশো বৎসরে বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম ফলবতী ভাষা হিসাবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা আমাদের সামগ্রিক আলোচনাকে অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে বাংলা ও অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্য থেকে বাংলা ও অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্যের উদ্ভবের স্তরগুলোকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে অনুসরণ করতে পারি —

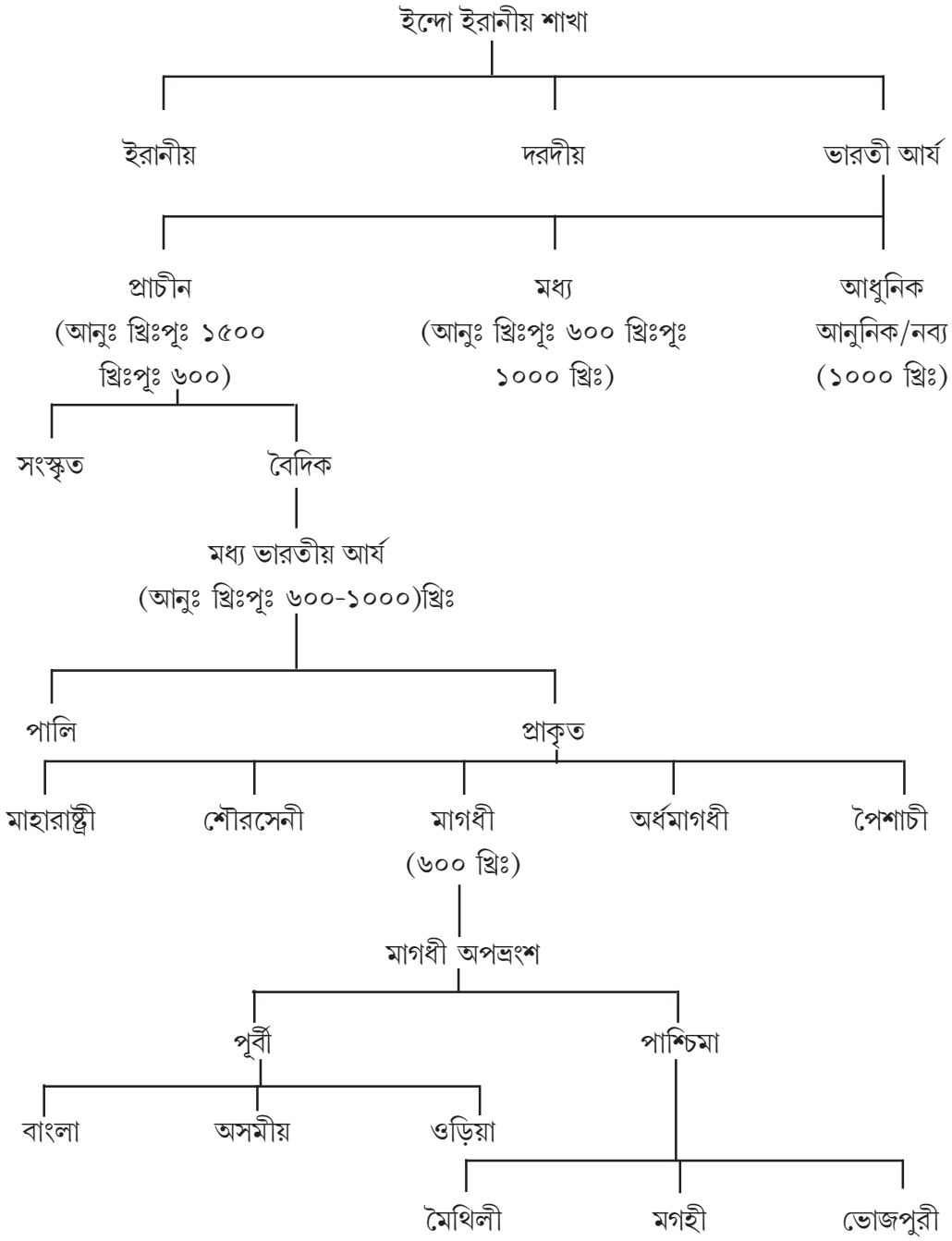

১.৩.১ বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। তারপর প্রায় হাজার বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলা ভাষা রূপ থেকে রূপান্তরে উপনীত হয়েছে, ভাষাদেহে বিভিন্ন লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। বাংলা ভাষার এই লক্ষণ সমূহের বিচারে বাংলা ভাষার এই হাজার বছরের ইতিহাসকে সাধারণভাবে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

১) প্রাচীন বাংলা : আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে, 'অমর কোষ'-এর সর্বানন্দ রচিত টীকায় প্রদত্ত চার শতাধিক বাংলা প্রতিশব্দে, বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস রচিত 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডন' গ্রন্থে উৎকলিত কয়েকটি বাংলা কবিতায় এবং 'সেক-সুভোদয়া'য় উদ্ধৃত গানে ও ছড়ায়। ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন, পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি, য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি, -এর/-অর/-র বিভক্তিযোগে সম্বন্ধপদ, - ক/-কে/-রে বিভক্তি যোগে গৌণ কর্ম ও সম্প্রদানের পদ, - ই /- এ/-হি /- তে বিভক্তিযোগে অধিকরণ, - এঁ বিভক্তিযোগে করণের পদ সৃষ্ঠি, বিভক্তির স্থানে কিছু অনুসর্গের ব্যবহার ইত্যাদি এই পর্বের বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব।

২) মধ্যবাংলা : এই পর্বের বিস্তৃতি আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য যে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বের মধ্যে রচিত বাংলা ভাষার কোনো নির্দেশন পাওয়া যায়নি। তাই এই পর্বটিকে অনুর্বর পর্ব বা অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব বলা হয়। এই সূত্রে সঠিক বিচারে বলতে হয় যে মধ্যবাংলার কালপর্বের আরম্ভ ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। মধ্যবাংলার সুদীর্ঘ প্রায় ৪০০ বৎসরের ইতিহাসকে দুটি উপ-পর্বে ভাগ করা হয় --

ক) আদিমধ্য : আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন। এই পর্বের বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব আ- কারের পরবর্তী ই/উ ধ্বনির ক্ষীণতা, সর্বনামের কতৃ কারকের বহু বচনে - [রা] বিভক্তি, - ইল যোগে অতীত কালের এবং [- ইব] যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ গঠন, আছ ধাতু যোগে যৌগিক কালের পদ সৃষ্টি ইত্যাদি।

খ) অন্ত্যমধ্য : আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ । মঙ্গলকাব্যর বিভিন্ন ধারা, বৈষ্ণব সাহিত্য, 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'ভাগবত'-এর অনুবাদ ইত্যাদি এই পর্বের ভাষার নিবেদন। এই সময়ে বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী পদান্তিক স্বরধ্বনির লোপ প্রবনতা, মধ্যস্বরের লোপের ফলে দ্বিমাত্রিকতা, অপিনিহিতি, নামধাতুর ব্যবহার, আরবি - ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি।

৩) আধুনিক বাংলা : ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আধুনিক বাংলার যাত্রা শুরু, যা অদ্যবধি, প্রবহমান। আধুনিক বাংলার প্রধান বৈশিষ্ট্য গদ্যরীতির প্রচলন। এই পর্বে লেখ্য ভাষা রূপে যে সাধু ভাষার প্রতিষ্ঠা হল তাতে কথ্য ভাষার মিশ্রণ একান্তভাবে নিষিদ্ধ হল। কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করে চলিত ভাষা নামে শিষ্টজনসম্মত এক সাহিত্যিক ভাষা গড়ে উঠেছে। এই যুগের চলিত বাংলার প্রধান বিশেষত্ব হল অভিশ্রুতি,স্বরসংগতি, ইংরেজি শব্দের বহুল অনুপ্রবেশ ও ছন্দবৈচিত্র্য।

আত্ম- সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসকে কী কী ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ? প্রত্যেকটি স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন। (২০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যের ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন।

(সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

(খ) মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

(সংকেত সূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

১.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। আমাদের এই সামগ্রিক আলোচনার সারসংক্ষেপ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে আধুনিক ভারতবর্ষের ভাষাসমূহের অধিকাংশই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম ইন্দো-ইরানীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার তিনটি ভাগ — ইরানীয়, দরদীয় ও ভারতীয় আর্য। আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ১৫০০ অব্দ থেকে ভারতীয় আর্যের যাত্রা শুরু। ভারতীয় আর্যকে তিনটি স্তরে চিহ্নিত করা হয়েছে — প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য ও নব্য ভারতীয় আর্য। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ — বৈদিক ও সংস্কৃত। খ্রিঃপূঃ ১২০০ থেকে খ্রিঃপূঃ ৬০০ পর্যন্ত বৈদিক ভাষার বিস্তার। শেষের দিকে নানাবিধ লৌকিক বিকৃতি, লোকমুখের ভাষা ও শব্দের অন্তর্ভুক্তি বৌদিকের ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ওই সময়ের দেব ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য প্রাচীন আদর্শে প্রচলিত ভাষার সংস্কার সাধন করা হয়। এটিই সংস্কৃত ভাষা। সময়ের টানে বৈদিক ভাষা থেকে খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার উদ্ভব। মধ্য ভারতীয় আর্যের চারটি স্তর চিহ্নিত করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ। মধ্য ভারতীয় আর্যের শেষতম স্তর অপভ্রংশ মাগধী। এর দুটি ভাগ — পূর্বী ও পশ্চিমা। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতকে পূর্বী মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া এবং পশ্চিমা থেকে ভোজপুরী, মৈথিলি ও মগহী ভাষাগুলির জন্ম হয়।

বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসকে ভাষাতত্ত্বের বিচারে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়— প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা ও আধুনিক বাংলা। প্রাচীন বাংলার একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। মধ্য বাংলার যাত্রা শুরু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', এছাড়া ছিল বৈষ্ণব সাহিত্য অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি। আধুনিক বাংলার প্রধান বৈশিষ্ট্য গদ্যরীতির প্রচলন।

১.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

ইন্দো-ইউরোপীয় : পূর্ব সীমায় ভারত এবং পশ্চিম সীমায় ইউরোপের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভূখণ্ডে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির তুলনামূলক অধ্যয়নের সাহায্যে ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ভারত ইরান এবং ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাই একটি মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই ভাষার সর্বাধিক পরিচিত নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা।

নিয়া প্রাকৃত : চিনের অন্তর্গত তুর্কিস্থানে শান্‌শান্ রাজ্যের প্রান্তে নিয়া নামক অঞ্চলে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ কিছু প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে। এগুলি ধর্মবিষয়ক নয় — শাসন কার্য ও ব্যবসা সংক্রান্ত। এগুলির ভাষাই নিয়া প্রাকৃত নামে পরিচিত। এই ভাষাকে ক্রান্তিপর্বের (খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতক — খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সন্ধিপর্বের ভাষার নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা হয়। ভারতের বাইরে প্রাপ্ত হলেও উত্তর পাশ্চিমা প্রাকৃতের কিছু উত্তরাধিকার এতে লক্ষ করা যায়।

১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১) ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন স্তর নির্ণয় করুন এবং সেই সূত্রে বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করুন।

২) বাংলা ও অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষা গুলির বিবর্তন কীভাবে হয়েছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তার বিবরণ দিন।

৩) মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে কীভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল তা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে বিবৃত করুন।

৪) বাংলা ভাষার বিবর্তনে যেকটি ঐতিহাসিক স্তর আছে তাদের কালক্রম ও বিশেষত্ব নিরূপন করুন।

৫) পাণিনি পরিশিলিত সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী হিসাবে গ্রহণ করা কতদূর যুক্তিসংগত আলোচনা করুন। মধ্য ভারতীয় আর্যের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্কত এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করুন।

১.৭ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-২

মগধীয় ভাষাগুচ্ছ

মগধীয় ভাষাগুচ্ছ : উৎপত্তি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বাংলা-সহ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

বিষয় বিন্যাস

২.০ ভূমিকা (Introduction)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ মগধীয় ভাষাগুচ্ছ

- ২.২.১ ভোজপুরিয়া
- ২.২.২ মৈথিলি
- ২.২.৩ মগহি
- ২.২.৪ ওড়িয়া
- ২.২.৫ অসমিয়া
- ২.২.৬ বাংলা

২.৩ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

- ২.৩.১ সাধারণ বৈশিষ্ট্য

২.৪ বাংলা ভাষা

- ২.৪.১ লক্ষণ ও স্তরবিভাগ
- ২.৪.২ সাধারণ বৈশিষ্ট্য
  - ২.৪.২.১ প্রাচীন বাংলা
  - ২.৪.২.২ মধ্য বাংলা
  - ২.৪.২.৩ আধুনিক বাংলা

২.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

২.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

২.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

২.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ভাষারই সাধারণত দুটি রূপ থাকে — একটি তার সাহিত্যিক রূপ এবং অন্যটি কথ্য রূপ। বস্তুত কথ্য ভাষার জীবন্ত রূপের উপরে ভিত্তি করেই সাহিত্যের ভাষার পরিশীলিত ও মার্জিত রূপটি গড়ে ওঠে। ভাষার সাহিত্যিক রূপ সাহিত্যে বিধৃত হয় বলে পরবর্তীকালে তার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু কথ্য ভাষার নিদর্শন প্রায়ই পরবর্তীকালে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারও দুটি রূপ বা দুটি ছাঁদ ছিল — একটি সাহিত্যিক ও অন্যটি কথ্য। বেদের ভাষায় বিশেষত ঋগ্বেদ- সংহিতায় এর সাহিত্যিক রূপটির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই পর্বের ভাষার কথ্য রূপটির প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয় নামে তিনটি আঞ্চলিক ভেদ বা উপভাষা ছিল। এর কথ্য রূপগুলি সাহিত্যে বিধৃত হয়নি এবং লোকমুখে কালে কালে পরিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় যুগে প্রবেশ করেছে। এই কথ্য রূপগুলি থেকেই জন্ম হয়েছে ভারতীয় আর্য ভাষা প্রাকৃতের। প্রাকৃত ভাষার প্রথম স্তরে চারটি আঞ্চলিক উপভাষা রূপলাভ করেছিল-- উত্তরপশ্চিমা, দক্ষিণপশ্চিমা, প্রাচ্যমধ্যা ও প্রাচ্যা। অশোক অনুশাসনের এই প্রাকৃতগুলির নিদর্শন মূলত সেযুগের কথ্যভাষার নিদর্শন। অশোক বুদ্ধের বাণীগুলি সাধারণের কথ্যভাষাতেই প্রচার করতে চেয়েছিলেন। প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরে পূর্ববর্তী প্রাকৃতের আঞ্চলিক কথ্য রূপগুলির উপরে ভিত্তি করে সাহিত্যিক ভাষার রূপ গড়ে তোলা হল। দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যিক প্রাকৃতের পাঁচটি উপভাষা --- মাহারাষ্ট্রী; শৌরসেনী; মাগধী; অর্ধমাগধী ও পৈশাচী। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির নিদর্শন ধরা পড়েছে প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্যে, গীতিকাব্যে, জৈন ধর্ম-সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণির চরিত্রের সংলাপের ভাষায়। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতসমূহ সাহিত্যের ভাষা হিসাবে স্বীকৃত, কিন্তু সমসাময়িক কালে নিশ্চয়ই জনসাধারণের মৌখিক ভাষারও একটি স্বতন্ত্র রূপ ছিল; যদিও সাহিত্যিক প্রাকৃতের সমকালীন মৌখিক প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অনুমান করা যায় যে প্রত্যেক শ্রেণির সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় যে মৌখিক প্রাকৃত ছিল তা লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করেছিল। এই তৃতীয় স্তরটি অপভ্রংশ নামে চিহ্নিত। অপভ্রংশেরই শেষ রূপ অবহট্‌ঠ। গ্রিয়ার্সন প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রত্যেক শ্রেণির সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে সেই শ্রেণির অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়েছিল। যেমন মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ; শৌরসেনী থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ; অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ; মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ এবং পৈশাচী প্রাকৃত থেকে পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। বিভিন্ন প্রাকৃত থেকে জন্ম লাভ করা এই সমস্ত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষার একএকটি থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম। একটি প্রাকৃত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে জাত ভাষাগুলিকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণি গড়ে উঠেছে।

প্রাচ্য থেকে জাত মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন

পাওয়া যায়নি। মাগধী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি দুটি শাখায় বিভক্ত -- পশ্চিমা শাখা ও পূর্বী শাখা। পশ্চিমা শাখা থেকে তিনটি আধুনিক ভাষার জন্ম হয়েছে। এই তিনটি ভাষা হল মৈথিলি, মগহি ও ভোজপুরি। পূর্বী শাখা থেকে প্রথমাবস্থায় ওড়িয়া এবং বঙ্গ-অসমিয়া নামে দুটি উপশাখা বা দুটি আধুনিক ভাষার জন্ম হয়। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গ-অসমিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা ও অসমিয়া নামে দুটি আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয়। এই ভাষাগুলির মধ্যে ভোজপুরি পশ্চিম বিহারে, বারাণসী-ভোজপুর-রোহতাস-সাসারামে প্রচলিত। মধ্যযুগের বিখ্যাত সাধক কবি কবিরের দোহাগুলি ভোজপুরি ভাষাতে রচিত। মগহি প্রাচীন মগধের ভাষা। পাটনা-গয়া-মুঙ্গের-হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভাষার কেন্দ্র। প্রাচীন মিথিলা অর্থাৎ আধুনিক উত্তর-বিহার অঞ্চলের ভাষা মৈথিলি। পঞ্চদশ শতকের কবি বিদ্যাপতির রচনায় সমৃদ্ধ এই ভাষার সঙ্গে একদা বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পূর্বী-মাগধীর তিনটি ভাষা বাংলা, অসমিয়া ও ওড়িয়ার মধ্যে বাংলা ও অসমিয়া মূলত একই লিপিতে লেখা হয়, ওড়িয়ার পৃথক লিপি আছে। এই তিনটি ভাষাই সমৃদ্ধ সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে, বিশেষ করে বাংলা রবীন্দ্রখ্যাতিতে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছে। মাধব কন্দলীর রচিত রামায়ণ (খ্রিস্টীয় ১৪শ শতক) ও বৈষ্ণব কবি শঙ্করদেব রচিত পদাবলি ও নাটক (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী) প্রাচীন ও মধ্যযুগের অসমিয়া ভাষার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষা যথাক্রমে মূলত আসাম ও ওড়িশায় প্রচলিত। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, ছোটোনাগপুর, মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলেও ওড়িয়া ভাষা প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা ও বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

মাগধী গোষ্ঠী থেকে জাত ভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (২০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা 'প্রাচ্য' থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের স্তরগুলি কী কী ? (১৫০ টি শব্দের মধ্যে

.....

.....

.....

.....

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

দ্বিতীয় বিভাগে আমাদের আলোচ্য মগধীয় ভাষাগুচ্ছের উৎপত্তির ইতিহাস এবং সেই সমস্ত ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাংলা সহ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির লক্ষণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহও আমাদের এই পর্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে —

- আপনারা মগধীয় ভাষাগুচ্ছের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মগধীয় ভাষাগুচ্ছের অন্তর্গত ছয়টি ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও তাদের প্রত্যেকটির বিশেষত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের সাধারণ লক্ষণ ও বাংলা ভাষার তিনটি যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২.২ মগধীয় ভাষাগুচ্ছ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কথ্যরূপের ভাঙনের ফলে প্রথমে তিনটি আঞ্চলিক ভাষারূপের সৃষ্টি হয়েছিল— প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয়। অশোকের সমসাময়িক কালে এই ভাষার চারটি আঞ্চলিক রূপ পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমা, দক্ষিণপশ্চিমা, প্রাচ্যমধ্যা ও প্রাচ্যা। সাহিত্যিক প্রাকৃতের কালে প্রাচ্যা শাখার পূর্বী উপশাখা থেকে মাগধী প্রাকৃতের সৃষ্টি হয়। মাগধী প্রাকৃত কথ্যরূপে আরো সরলীকৃত হল মাগধী অপভ্রংশে। মাগধী অপভ্রংশের দুটি শাখা— পূর্বী ও পশ্চিমা। পশ্চিমা শাখা থেকে মৈথিলি মগধি ও ভোজপুরি এবং পূর্বী শাখা থেকে বাংলা অসমিয়া ও ওড়িয়া মোট এই ছয়টি ভাষার সৃষ্টি হয়। মাগধী প্রাকৃত তথা মাগধী অপভ্রংশ থেকে জাত এই ছয়টি ভাষাকে একযোগে বলা হয় মগধীয় ভাষাগুচ্ছ।

মাগধী প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষা। সংস্কৃত নাটকে এই ভাষাকে হাস্যরস সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর কিছু বিভাষাও আছে। যেমন — চণ্ডালী, শকারী ও শাবরী। মগধীয় ভাষাগুলির মধ্যে ভোজপুরি, মৈথিলি, মগহি এই তিনটিকে পশ্চিম মগধীয় এবং বাংলা, অসমিয়া ওড়িয়া এই তিনটিকে পূর্ব মগধীয় শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে বাংলা, বিহার, ওড়িশা, ছোটোনাগপুরের কিছু অঞ্চলে মগধীয় ভাষার বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে।

মগধীয় ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ হল [-ল] প্রত্যয়ান্ত অতীত কাল এবং [-ব] প্রত্যয়ান্ত ভবিষ্যৎ কাল গঠন এবং অতীত কালের প্রথম পুরুষে সকর্মক, অকর্মক ক্রিয়ার রূপভেদ। যেমন-বাং. দেখিল, চলিল, থাকবে; ভোজপুরি দেখলবা (চিড়িয়া ভাগলবা), অসমিয়ায়, যাব (সি যাব); মৈথিলিতে দেখলক, চলিল ইত্যাদি। কাশী অঞ্চলের কবির ভোজপুরিতেই তাঁর গানগুলি রচনা করেন, এছাড়া ভোজপুরির আর কোনো সাহিত্য

নেই, মগহিও সাহিত্য-শূন্য। মৈথিলি ভাষায় চতুর্দশ শতক থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়, বিদ্যাপতি এই ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। দশম শতক থেকেই বাংলা অসমিয়া ওড়িয়ায় সাহিত্যচর্চ্চা শুরু হয়। তবে দ্বাদশ শতক থেকেই ওড়িয়ার স্রোত দূরে সরতে শুরু করেছে, আর অসমিয়া বাংলা থেকে আলাদা হয় মোটামুটিভাবে ত্রয়োদশ শতকে। এই ভাষার সঙ্গে বাংলার পার্থক্য খুব অল্পই। মগধীয় ভাষাগুচ্ছের উদ্ভবের স্তরগুলি আমরা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে চিহ্নিত করতে পারি —

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

প্রথম স্তর	মধ্য স্তর	অন্ত্য স্তর
আশোক প্রাকৃত ও পালি	সাহিত্যিক প্রাকৃত	অপভ্রংশ

শৌরসেনী মাহারাষ্ট্রী মাগধী অর্ধমাগধী পৈশাচী

অপভ্রংশ

পূর্বী পশ্চিমা

বাংলা অসমিয়া, ওড়িয়া মৈথিলি, মগহি, ভোজপুরিয়া

২.২.১ ভোজপুরিয়া

পশ্চিমে বারাণসী থেকে আরম্ভ করে উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ, মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এবং বিহারের অনেকাংশ জুড়ে ভোজপুরিয়া ভাষা প্রচালিত। এতে প্রাচীন সাহিত্য নেই, তবে কথ্য লোকসাহিত্য এবং লোকগীত দীর্ঘদিন ধরেই বর্তমান। সাম্প্রতিককালে রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ ভোজপুরিয়া ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য রচনা করে ভাষাটির উজ্জীবনে সচেষ্ট হয়েছেন। পরিবারিক ও সামাজিক কাজকর্মে ভোজপুরিয়ার নিজস্ব লিপি 'কাইথি' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সাহিত্যকর্মে 'নাগরী' অক্ষরে হিন্দি ভাষাই প্রচলিত। ভোজপুরিয়ার ভাষাগত লক্ষণ অনেকাংশে মৈথিলির মতোই। এতে মগহির মতো শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ-অতিদীর্ঘ উচ্চারণ বজায় আছে ('মালী, মলিয়া, মলিয়বা')। ২য়া /৪র্থী /৬ষ্ঠীতে '-কে' বিভক্তি, ৩য়া-৫মী তে '-সে/-সেঁ' ৭মীতে 'মেঁ/পর'। যৌগিক কালে ক্রিয়াপদে 'রহ' 'বাট/বাড়' ধাতুর প্রয়োগ (বহ্ আয়ত রহে)। অস্ত্যর্থক ধাতুর সঙ্গে '-খে-' প্রত্যয়ের ব্যবহার এবং লিঙ্গানুশাসনের শিথিলতা (হমার / হমারি গাই) এই ভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

২.২.২ মৈথিলি

বর্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মিথিলা বা প্রাচীন বিদেহ অঞ্চলের ভাষা মৈথিলি। পণ্ডিত গ্রিয়ার্সনের মতানুসারে মৈথিলি 'বিহারি'র উপভাষা। বিহারি ভাষাগুলির মধ্যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিচারে মৈথিলি অগ্রগণ্য। মগহির সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশি থাকায় মগহিকে অনেকে মৈথিলির উপভাষা বলে মনে করেন। বিহারের দ্বারভাঙ্গা, মজফ্‌ফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া এবং পূর্ব চম্পারন অঞ্চল এর প্রচলন স্থান। চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে উমাপতি ওঝার 'পারিজাতহরণ' নাটকের পদাবলি, জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনরত্নাকর' মৈথিলি ভাষার প্রাচীন নিদর্শন।

মৈথিলি ভাষায় একসময় 'তিরহুতি' ও 'কাইথি' লিপি ব্যবহৃত হত। অধুনাতন কালে দেবনাগরি লিপি ব্যবহৃত হওয়ায় অনেকের ধারণা এই ভাষা হিন্দি ভাষার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত কারণ এই ভাষাগোষ্ঠীতে এখনও বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া ভাষাগোষ্ঠীর মতোই অতীতকালে '-ল' প্রত্যয় (ভৈল=হইল, কিন্তু হিন্দিতে 'হুয়া থা') এবং ভবিষ্যৎকালে '-ব' প্রত্যয় (যাওব=যাব, হিন্দিতে 'যাউঙ্গা') ব্যবহৃত হয়। মৈথিলির ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি হল — পদান্ত অ, ই, উ অতি হ্রস্ব উচ্চারণ। বিভক্তি রূপে ৬ষ্ঠীতে '-কা', 'কো' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আবার '-র' এর প্রয়োগও রয়েছে। বহুবচন পদ গঠনে 'সব্', 'লোকনি' প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করা হয়। বিশেষণমূলক বা যৌগিক পদের সহায়তায় মৈথিলিতে কর্মবাচ্যের পদ গঠন করা হয়। হিন্দির মতোই লিঙ্গ বিচারে যেমন কঠোরতা রয়েছে, তেমনি আবার বাংলার মতো শিথিল প্রয়োগও যথেষ্টই রয়েছে। বাংলার মতোই বিভিন্ন কারকে বিভক্তির স্থলে অনুসর্গের ব্যবহার এই গোষ্ঠীতে প্রচলিত। যৌগিক কাল বোঝাতে 'আছ্' এবং 'রহ্' ধাতুর প্রয়োগ মৈথিলি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২.২.৩ মগহি

মগহি নামের ঐতিহ্য বহন করলেও মগহি ভাষাকে পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আবার অন্য একদল মনীষী এই ভাষাকে স্বতন্ত্র একটি ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। মূলত পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, গয়া, পালামৌ প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভাষাটি প্রচলিত। মগহির প্রাচীন সাহিত্য কোনো কিছু পাওয়া যায়নি, তবে কথ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে গাথা কবিতা, লোকগীতি প্রভৃতি এর সমৃদ্ধির পরিচায়ক। সাম্প্রতিক কালে কিছু সাময়িক পত্র, ছোটোগল্প প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে ভাষাটির পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চলছে। এই ভাষা অনেকাংশেই মৈথিলির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। মগহির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এরূপ মগহির উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ-দীর্ঘতর ভেদ রয়েছে ('ঘোড়-ঘোড়া-ঘোড়বা'), লিঙ্গশাসন শিথিল। বহুবচন প্রত্যয় '-ন' (ঘোড়া-ঘোড়ন)। ২য়ায় বিভক্তি '-কে', তৃতীয়া/৫মীতে '-সে', ৬ষ্ঠীতে '-কে', কের', ৭মীতে '-মে'। অতীত ও

ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ামূল যথাক্রমে '-অল' এবং '-অব' বিকরণযোগে গঠিত হয়।

২.২.৪ ওড়িয়া

দ্বাদশ শতকের তাম্রশাসনে ওড়িয়া ভাষার নিজস্ব পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব যুগে অশোকের শিলালিপি এবং নৃপতি খারবেলের 'হাতিগুম্ফা লিপি' প্রাচীন ওড়িশার মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক। খ্রিস্টীয় দশম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত অন্তত ৬০টি প্রস্তর লিপি বা তাম্রলিপি ওড়িশায় পাওয়া গেছে। ওড়িশায় ভাষার মিশ্রণ এত বেশি যে এর উপভাষাগুলিকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায়না। তবে যে পাঁচটি উপভাষা ওড়িশায় প্রচলিত তার মধ্যে পুরী ও কটক জেলার উপভাষাই শিষ্ট কথ্য ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলার মতোই ওড়িয়াতেও চর্যাপদকেই ভাষার আদি নিদর্শন রূপে মেনে নেওয়া হয়। দ্বাদশ শতকের 'মাদলাপঞ্জী' এবং ত্রয়োদশ শতকের অবধূত নারায়ণস্বামী রচিত 'রুদ্র সুধানিধি' ওড়িয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সাহিত্য।

ধ্বনি পরিবর্তনের দিক থেকে ওড়িয়া ভাষা রক্ষণশীল। এতে কিছুটা দ্রাবিড় ও মারাঠি প্রভাবের পরিচয় রয়েছে। এই ভাষায় পদমধ্যস্থ ও পদান্তে 'অ' ধ্বনি বর্তমান রয়েছে। 'ঋ'-কারের উচ্চারণ 'রু', 'ণ'-এর উচ্চারণ 'ড়ঁ'। 'ল'-এর উচ্চারণে দ্রাবিড় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ এবং স্বরসংগতির অভাবহেতু অন্য সমস্ত স্বরধ্বনির উচ্চারণও অনেকটা অব্যাহত রয়েছে। বানানে ও উচ্চারণে ওড়িয়ায় পার্থক্য কম। স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ বাংলার মতোই হ্রস্ব, তবে 'আ' কখনো দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। নাসিক্য ধ্বনির মহাপ্রাণতা ওড়িয়ার অন্যতম উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য — ন্হ, ম্হ। শিসধ্বনিগুলি বাংলায় 'শ' উচ্চারিত হলেও ওড়িয়ায় উচ্চারণ 'স'। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির কোনো একটির লোপ বা সন্ধি হয় অথবা যৌগিক স্বরে পরিণত হয়, কিন্তু ওড়িয়ায় স্বরসংযোগ হয় অর্থাৎ দুটিই স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে — 'ঘিঅ, পুঅ'। ওড়িয়ায় বহুবচনে '-এ' এবং '-মান' বিভক্তি, কর্মকারকে '-পু', অপাদানে '-রু' এবং '-উ' বিভক্তি, অধিকরণে '-ত' এবং 'ভূ' ধাতুর 'হে' পরিণতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২.২.৫ অসমিয়া

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সমকালীন সময় থেকে অসমিয়া ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক শংকরদেবের প্রভাবে অসমিয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলির মধ্যে অসমিয়া ভাষাতেই সম্ভবত সর্বপ্রথম নাটক ও গদ্যসাহিত্য রচিত হয়। বাংলা ভাষার যে শাখাটি 'কামরূপী' নামে পরিচিত সেই শাখাটিই দেশ- কালোচিত রূপান্তরে আনুমানিক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের দিকে অসমিয়া ভাষায় পরিণতি লাভ করেছে বলে পণ্ডিতগণের অনুমান। ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের মধ্যে সম্ভবত অসমিয়া ভাষাতেই বহিঃপ্রভাব সর্বাধিক। কারণ এই ভাষায় একদিকে তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার (বোড়ো, গারো, মেইথেই, নাগা, মিজো, মিকির

প্রভৃতি) প্রভাব, অন্যদিকে অস্ট্রিক তথা নিষাদ গোষ্ঠীর ভাষার প্রভাব পড়েছে। বাংলার সঙ্গে অসমিয়ার প্রধান পার্থক্য শব্দ-ব্যবহারে। উভয় ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্য বেশি নেই। লিপিবিধি প্রায় এক, দুয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে; তবে উভয় ভাষার মধ্যে বেশ কিছু উচ্চারণগত পার্থক্য বর্তমান। 'ণ' ধ্বনির প্রবণতা অসমিয়া ভাষায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'ত' বর্গের স্থলে 'ট' বর্গের উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তালব্য বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণ উষ্মীভূত, অর্থাৎ 'চ' স্থলে 'স' (S) এবং 'জ' স্থলে জ় (Z) উচ্চারণ এই ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'স' - এর উচ্চারণ অনেকটা 'হ' - এর মতো (কণ্ঠনালীর সংকোচনে অনেকটা 'খ' - এর মতো)। এছাড়াও বিভক্তি ব্যবহারে কিছু বৈচিত্র্য রয়েছে, যেমন - ৭মীতে 'ৎ' বিভক্তির প্রয়োগ।

২.২.৬ বাংলা

পূর্বী প্রাচ্যার তৃতীয় শাখা বাংলা ভারতে সর্বাধিক উন্নত ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাংলা ভাষাতেই রচিত হয়। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের প্রভাব এবং আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের দরবারে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা ভাষার কয়েকটি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ -

বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় দুটি — ঈ (ই) এবং -(ই) নী, প্রথমটি জাতিবাচক, দ্বিতীয়টি বৃত্তিবাচক। বচন দুটি। -রা, গুলা/গুলি, -দিগ এবং সমষ্টিবাচক সব, গণ ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রত্যয় ও বহুত্ববাচক শব্দযোগে বহুবচন গঠিত হয়। আধুনিক বাংলায় কারক চারটি — কর্তা, কর্ম, করণ-অধিকরণ ও সম্বন্ধ। কর্তা ও কর্ম কারকের বিশিষ্ট বিভক্তি নেই। অধিকরণ ও করণের বিশিষ্ট বিভক্তি -এ। অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি -ত / -তে, -এ। বাংলা অনুসর্গের দুটি ভাগ — নাম অনুসর্গ ও সমাপিকা অনুসর্গ। উপসর্গের ব্যবহার বাংলায় খুব কম।

বাংলায় সর্বনাম পদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত — পুরুষবাচক সর্বনাম এবং নির্দেশক সর্বনাম। উৎপত্তির বিচারে বাংলা ক্রিয়াপদের কাল দুইভাগে বিভক্ত — মৌলিক ও কৃদন্ত। আধুনিক বাংলার একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য যৌগিক কালের ব্যবহার। বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ারও প্রচলন রয়েছে ।

বাংলা বাক্যগঠনের দুটি অংশ — উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাংলা ভাষায় উক্তি দুই জাতীয় — প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। বাংলায় প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার বেশি। বাক্য সাধারণত তিন ধরনের — সরল, জটিল ও যৌগিক।

বাংলা ভাষায় যে সব বিদেশী শব্দ গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ ও ইংরেজি শব্দসমূহ উল্লেখযোগ্য।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

মগধীয় ভাষাগুচ্ছ বলতে কী বোঝায়? এর অন্তর্গত ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ কী? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

ভোজপুরি-মৈথিলি-মগহি এই তিনটি ভাষার মধ্যে সম্পর্কসূত্র কী? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

বাংলা ভাষার কয়েকটি বিশেষত্ব নির্দেশ করুন। (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

২.৩ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

অপেক্ষাকৃত দূরতর উৎসের বিচারে ভারতের সমস্ত নবীন আর্যভাষাই এক উৎস থেকে জাত — প্রাচীন ভারতীয় আর্য বৈদিক সংস্কৃত। তবে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির অব্যবহিত জন্মের উৎসের বিচারে দেখা যায় যে সমস্ত নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা এক উৎস থেকে জন্মলাভ করেনি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে যে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা প্রাকৃত অপভ্রংশের জন্ম সেই প্রাকৃত অপভ্রংশই হল নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম -উৎস। কিন্তু একটিমাত্র মূল অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট থেকে সমস্ত নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা জন্মলাভ করেনি। অপভ্রষ্টের সাহিত্যিক নিদর্শনে আঞ্চলিক রূপভেদের বিশেষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাদের কথ্যরূপে নিশ্চয়ই আঞ্চলিক পার্থক্য বর্তমান ছিল এবং সেই পার্থক্য অনেক আগে থেকেই ভারতীয় আর্য ভাষায় সূচিত হয়েছিল। প্রাকৃত-অপভ্রংশের যেসব আঞ্চলিক রূপভেদ বা উপভাষা ছিল সেই সমস্ত রূপভেদ থেকে

ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় আরো আঞ্চলিক রূপভেদের ফলেই নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি পৃথক পৃথক রূপ লাভ করেছে এবং এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। বিবর্তনের ধারায় ভারতের আর্য ভাষাগুলি কালগত বিচারে যে নব্য ভারতীয় আর্য পর্বে পদার্পণ করল, সেই পর্বের নবীনতার কিছু সাধারণ চিহ্ন বর্তমান। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার এইসব সাধারণ লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা উল্লেখ করতে পারি।

২.৩.১ সাধারণ বৈশিষ্ট্য

আমাদের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে, এবারে এর আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

(ক) দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার কোনো কোনো উপভাষায় লুপ্ত হয়ে যেত, কিন্তু ওই ব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট স্বরটি লোপ পেত না। এই সংরক্ষিত স্বরকে বলা হয় অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত স্বর। যেমন - ঘৃত (ঘ্+ঋ+ত্+অ)>ঘিঅ(ঘ্+ই+অ)। এখানে দেখা যাচ্ছে 'ত' লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তৎসংলগ্ন 'অ' রয়ে গেছে। এই 'অ' উদ্বৃত্ত স্বর। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিতে এই উদ্বৃত্ত স্বরের নানারকম পরিণতি ঘটেছে। কখনো এই স্বর লুপ্ত হয়েছে। যেমন — ঘৃত >ঘিঅ>বাং ঘি। কখনো উদ্বৃত্ত স্বরের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী স্বরের সন্ধি হয়েছে। যেমন— গত>গঅ, গঅ+ইল্ল>বা গেল(অ+ই=এ)। কখনো উদ্বৃত্ত স্বর পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন — বধূ>বউ।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্ণীত হত পদান্তিক স্বরধ্বনি অনুসারে। পদান্তিক স্বরধ্বনি বিকৃত বা লুপ্ত হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার লিঙ্গবিধি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় থাকল না। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ ছিল শব্দের অর্থ নিরপেক্ষ। কিন্তু অনেক নব্য ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্ণীত হয় শব্দের অর্থ অনুসারে। যেমন — বাংলা পুরুষবোধক শব্দ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, অপ্রাণীবোধক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। কোনো কোনো নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় শব্দের লিঙ্গ অর্থনিরপেক্ষ হলেও সংস্কৃতের লিঙ্গবিধি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তা নিজস্ব প্রথানুসারে গড়ে উঠল। যেমন সংস্কৃতে 'দধী' শব্দ ছিল ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্য হিন্দিতে 'দধী' থেকে জাত শব্দ 'দহি' হল পুংলিঙ্গ, সিন্ধিতে 'দহি' স্ত্রীলিঙ্গ, মারাঠিতে ক্লীবলিঙ্গ। বাংলা, গুজরাটি, সিন্ধি ছাড়া অন্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ অপ্রচলিত।

(গ) শব্দরূপের বিচারে নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় কারক দুটি — মুখ্য কারক বা কর্তৃ কারক এবং গৌণ কারক বা তির্যক কারক। সংস্কৃতে কর্তৃ কারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল প্রথমা বিভক্তি। নব্য ভারতীয় আর্যে প্রথমায় প্রায়ই বিভক্তিহীনতা দেখা দিল। তাছাড়া

তৃতীয়ার অবক্ষয়জাত বিভক্তিও নব্য ভারতীয় আর্যে কর্তৃ কারকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। গৌণ কারকে বা তির্যক কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি বা সপ্তমী বিভক্তি যোগ করে তার সঙ্গে অনুসর্গ যোগের রীতি প্রচলিত হল। যেমন বাং 'আমার সঙ্গে', হি 'মেরে সাথ'।

(ঘ) অধিকাংশ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ থাকল না। বহুবচন বোঝাতে শব্দের পৃথক পৃথক রূপ নয়, বহুত্ববাচক পৃথক শব্দ অথবা ষষ্ঠী বিভক্তির অবক্ষয়িত রূপ ব্যবহৃত হল। যেমন বাং-পুরুষ+এর=পুরুষের>পুরুষেরা। আবার পশ্চিমা হিন্দি, সিন্ধি, মারাঠি প্রভৃতি কয়েকটি নব্য ভারতীয় ভাষায় একবচন ও বহুবচনের পৃথক রূপ লক্ষণীয়। যেমন একবচন — বাত, বহুবচন — বাতেঁ। শব্দের দ্বিত্ত করে বহুবচন প্রকাশের রীতিও দেখা যায়।

(ঙ) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় একাধিক ধাতুর সংযোগে যৌগিক কালের রূপ দেখা দিল। যেমন-বাং $\sqrt{}$ কর্ + ইয়া (এ) + $\sqrt{}$ আছ্ + এ = করেছে (এখানে কর্ ও আছ্ দুটি ধাতু মিলে একটি ক্রিয়া গঠিত হয়েছে)।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"গ্রীয়র্সনের মতে বহিরঙ্গ নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ এই — (১) পদান্ত ই-কার উ-কার ও এ-কারের অলোপ (যেমন, কা° অছি, সি° অখি, বিহারী আঁখি, বা° আঁখি < অক্ষি); (২) অপিনিহিতি; (৩) ইকার ও উকারের যথাক্রমে এ-কার ও উ-কার রূপে উচ্চারণ; (৪) উ-কারের ই-কারে পরিবর্তন; (৫) দ্বিস্বর ঐ-কারের ও ঔ-কারের দুই স্বরে পরিণমন(অর্থাৎ ঐ > অই, ঔ > অউ); (৬) চ-কারের স-কারবৎ এবং জ-কারের জ-(z)-কারবৎ উচ্চারণ; (৭) 'ঙ, ঞ' ধ্বনির অস্তিত্ব; (৮) ল > র, ড > ড়, দ > ড, ড > দ, দ > জ, -স্ব- > -ব-, স > হ, স(ষ) > শ; (৯) মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণহীনতা; (১০) যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি; (১১) স্ত্রীলিঙ্গের ঈ-কার; (১২) 'ভূ' ও 'স্থা' ধাতু হইতে উদ্ভূত শব্দের দ্বারা অপাদানের অর্থ প্রকাশ; (১৩) অনুসর্গজাতীয় শব্দ যোগে বহুবচনের পদ গঠন; (১৪) সকর্মক ধাতুর অতীত কালে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি, এবং কর্মের বিশ্লেষণ রূপে নিষ্ঠান্ত শব্দের ব্যবহার; (১৫) তদ্ধিত [-ল-] প্রত্যয়ের প্রয়োগ; এবং (১৬) 'আছ্' ধাতুর ব্যবহার।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এই সব লক্ষণকে বহিরঙ্গ ভাষাগুলির সাধারণ অথবা বিশেষ লক্ষণ কিছুই বলা চলে না। মারাঠী-সিন্ধীতে অপিনিহিতি নাই। 'উ > ই, ঐ > অই, ঔ > অউ' পশ্চিমা হিন্দীতেও অজ্ঞাত নয়। 'চ > স' এবং 'জ > জ', শুধু পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার ও অসমিয়ারই বিশেষত্ব। 'ল > র, ড > ড়' সিন্ধী-বিহারীর মতো পশ্চিমা হিন্দীরও বিশেষত্ব। 'দ > জ' নিতান্ত দুর্লভ ধ্বনিপরিবর্তন; এটিকে কোন ভাষার বা ভাষাগুচ্ছের বিশিষ্ট লক্ষণ বলা চলে না। '-স্ব- > -ব-, স > হ' পশ্চিমা হিন্দীতেও পাই। 'স(ষ) > শ' মাগধী প্রাকৃতেরই বিশেষত্ব। মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণহীনতা বাঙ্গালার সাধারণ বিশেষত্ব নয়, পদাদিতে তো হয়ই

না, এবং এ ব্যাপার পশ্চিমা হিন্দীতেও অসুলভ নয়। যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলতা অন্তরঙ্গ ভাষাগুলিতে যথেষ্ট দেখা যায়। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কার অন্তরঙ্গ ভাষাগুলিতেও অজ্ঞাত নয়। তদ্ধিত [-ল-] প্রত্যয় অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ নির্বিশেষে পাওয়া যায়।"

[ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

উদ্বৃত্ত স্বর কী? নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে এই উদ্বৃত্ত স্বর কী কী ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের লিঙ্গ নির্ণয় পদ্ধতির সঙ্গে নব্য ভারতীয় আর্যের লিঙ্গ নির্ণয় পদ্ধতির পার্থক্য কী? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

২.৪ বাংলা ভাষা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি যে কোনো নব্যভারতীয় আর্য ভাষাই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা রূপে পরিণত হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ -অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। যে অপভ্রংশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় সেটি মাগধী অপভ্রংশ। বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং তার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর -পরম্পরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। এই পর্বে আমরা এর পুনরুক্তি না ঘটিয়ে বাংলা ভাষার যে লক্ষণ অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার তুলনায় তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে সেগুলি উল্লেখ করব এবং বাংলা ভাষার তিনটি কালপর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করব।

২.৪.১ লক্ষণ ও স্তরবিভাগ

যে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ বাংলা ভাষাকে অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে পৃথক করেছে সেগুলি নিম্নরূপ —

(ক) [-ইল, -ইব] যোগে যথাক্রমে অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের রূপ।

(খ) [-ইয়া, -ইলে, -ইতে] যোগে অসমাপিকার সৃষ্টি।

(গ) [-এর] যোগে সম্বন্ধ পদ, [-বে, -কে, -ক] যোগে গৌণকর্ম - সম্প্রদানের, [-এ, -ত, -তে] যোগে অধিকরণের, [-রা] যোগে কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ সৃষ্টি।

(ঘ) বিশিষ্ট শব্দের যেমন 'দিয়া, করিয়া, থাকিয়া, হইতে, মাঝে, সঙ্গে, তরে, কাছে, পাশে, ঠাঁই' ইত্যাদির অনুসর্গরূপে ব্যবহার, এবং

(ঙ) নানাবিধ শিষ্ট প্রয়োগ (ইডিয়ম)।

বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাওয়া যায় — আদি, মধ্য ও আধুনিক। আদিস্তরের বাংলাকে প্রাচীন বাংলা বলা হয়। আমরা বাংলা ভাষার তিনটি স্তরের যুগবিভাগ, সময়সীমা ও প্রধান নিদর্শনসমূহ একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে চিহ্নিত করতে পারি।

১০০০ খ্রিঃ

চর্যাগীতি — প্রাচীন বাংলা

১২০০ খ্রিঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — আদিমধ্য

১৫০০ খ্রিঃ

বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদি — মধ্য বাংলা — অন্ত্যমধ্য

১৮০০ খ্রিঃ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ও খ্রিস্টান মিশনারিদের লেখা, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের রচনা ও মৌখিক বাংলা — আধুনিক বাংলা — বর্তমান কাল

২.৪.২ সাধারণ বৈশিষ্ট্য

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বাংলা ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করে পণ্ডিতগণ প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ নামে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেকটি স্তরেই বাংলা ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এবারে আমরা এক এক করে এই তিনটি স্তরের লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারি।

২.৪.২.১ প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন বা আদি স্তরের বাংলায় চর্যাগীতির ভাষা অনুসারে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়।

(ক) সম যুগ্ম ব্যঞ্জন একক এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘ হল। নাসিক্য (ঙ, ঞ, ণ, ম) যুক্ত ব্যঞ্জনে পূর্বস্বর দীর্ঘ হল। নাসিক্য ব্যঞ্জন ক্ষীণ হয়ে সানুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন — ধর্ম- > ধাম, জন্ম- > জাম, মধ্যেন > মঝেঁ (= মাঝে), বৃক্ষ- > রুখ (= রূখ), বন্ধ- > বান্ধ। অর্ধতৎসম শব্দে যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জন রয়ে গেল। যেমন — মিচ্ছা < মিথ্যা।

(খ) পদান্তে স্বরধ্বনি বজায় ছিল, তবে অনেক সময় যুক্তস্বর [-ইঅ] ঈ [ই]-কারে পরিণত হল। যেমন — ভণতি > ভণই, জ্বলিত- > জ্বলিঅ, পুস্তিকা > পোথিআ > পোথী।

(গ) প্রাচীন বাংলায় য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতি ছিল। যেমন - নিকটে > নিয়ড্ডি (= নিয়ড়ি), আয়াতি > আবয়ি (= আঅই), নাবেন > নাবেঁ (= নাএঁ)।

(ঘ) প্রাচীন বাংলায় [- এর, - অর, - র] বিভক্তির দ্বারা সম্বন্ধপদ নিষ্পন্ন হত। যেমন — 'রুখের তেন্তলি' (গাছের তেঁতুল), 'ডোম্বীএর সঙ্গে' (= ডোমনির সঙ্গে)।

(ঙ) [- ক, - কে, -রে] বিভক্তির দ্বারা গৌণকর্মের ও সম্প্রদানের পদ গঠিত হত। যেমন — নাশক (নাশের জন্য), বাহবকে পারই (বাহিতে পারে), 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই' (= কেহ কেহ তোরে বিরূপ বলে)।

(চ) অধিকরণের বিভক্তি ছিল [- ই, - এ, - হি, - তে] যেমন — নিয়ড্ডী (= নিয়ড়ি < নিকটে), ঘরে (< গৃহকে)।

রূপে এবং প্রয়োগে করণের সঙ্গে মিল থাকায় কখনো কখনো অধিকরণে [- এঁ] বিভক্তিও পাওয়া যায়। যেমন — ঘরেঁ।

(ছ) অপাদানের অর্থে অধিকরণের অর্থ নিহিত থাকায় অপাদানের অর্থে অধিকরণের বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন — 'জামে কাম কি কামে জাম'। অপাদানে অপভ্রষ্ট থেকে আগত [- হু] বিভক্তি দুএকটি পদে পাওয়া গেছে। যেমন — খেপহু, রঅণহুঁ।

(জ) করণের বিশিষ্ট বিভক্তি [- এঁ] সপ্তমীর সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় করণেও [- তেঁ - তে, এতেঁ] বিভক্তি দেখা গেল। যেমন — সাদেঁ (< শব্দেন), বোহেঁ (< বোধেন), মতিএঁ (< মন্ত্রি + এন), সুখদুখেতেঁ (< সুখদুঃখ + -এ + -ত + -এন)।

(ঝ) সংস্কৃত বহুবচন থেকে আগত 'আহ্মে' 'তুহ্মে' পদ দুটি একবচনেও ব্যবহৃত হতে লাগল, যদিও প্রাচীন একবচন 'হউঁ' তখনও লুপ্ত হয়নি। উত্তমপুরুষ সম্বন্ধপদ 'মো' (< মম) কর্তা কারকেও ব্যবহৃত হত।

(ঞ) কর্তৃকারক ছাড়াও অন্যান্য কারকের অর্থে বিবিধ পদ অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হত। যেমন — তঁই বিনু, তোহোর অন্তরে, দিআঁ চঞ্চালী।

(ট) কর্মভাব-বাচ্যে ক্রিয়াপদে অতীতকালে [-ই,-ইল] এবং ভবিষ্যৎ কালে [-ইব]বিভক্তি যুক্ত হত। ক্রিয়া সকর্মক হলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি এবং অকর্মক হলে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হত। কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে ক্রিয়াপদে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন- 'চলিল কাহ্ন', 'মই ভাইব' কিন্তু 'লাগেলি আগি'।

(ঠ) বাংলা ছাড়া অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না এখন বিশিষ্ট প্রয়োগ চর্যাগীতিতে সুলভ। যেমন- থির করি (স্থির করিয়া), গুণিয়া লেহু (গুণিয়া লই), দুহিল দুধু (দোহা দুধ)।

২.৪.২.২ মধ্য বাংলা

মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার দুটি সুস্পষ্ট উপস্তর দেখা যায়, আদিমধ্য এবং অন্ত্যমধ্য। আদিমধ্য বাংলার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, অন্ত্যমধ্য বাংলার সময়কাল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

[১] আদিমধ্য বাংলার প্রধান বিশেষত্ব

(ক) আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা এবং পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির স্থিতি। যেমন— বড়াই > বড়া^{ই}, আউলাইল > আ^{উ} লা^{ই}ল।

(খ) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ অথবা ক্ষীণতা অর্থাৎ 'হ্ন (নহ্)> ন' এবং 'হ্ম (ম্‌হ)> ম' যেমন— কাহ্ন > কান, আহ্মি > আমি।

(গ) [রা] বিভক্তির যোগে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ সৃষ্টি। যেমন- আহ্মারা, তোহ্মারা, তারা।

(ঘ) [-ইল] অন্ত অতীতের এবং [-ইব] অন্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। যেমন—মো শুনিলোঁ, মোই করিবোঁ।

(ঙ) প্রাচীন (-ইঅ-) বিকরণ-যুক্ত কর্মভাব-বাচ্যের ক্রমশ অপ্রচলন এবং 'যা' ও 'ভূ' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাব-বাচ্যের সমধিক প্রচলন । যেমন-

'সে কথা কহিল নয়'।

(চ) অসমাপিকার সঙ্গে 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন। যেমন— লইছে > লই + (আ)ছে, রহিলছে > রহিল + (আ) ছে (= রহিয়াছে)।

(ছ) বক্তার প্রাতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বোঝাতে 'গিয়া'ও 'সিয়া' (< আসিয়া), এই দুই অসমাপিকার ক্রিয়াপদে অনুসর্গরূপে ব্যবহার। যেমন— দেখ গিয়া > দেখ-গে, দেখ, সিয়া > দেখ-সে।

(জ) ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক- পজ্ঝটিকা থেকে চতুর্দশাক্ষর পয়ারের বিকাশ।

[২] অন্ত্যমধ্য বাংলার প্রধান বিশেষত্ব

(ক) অন্ত্যস্বরের লোপ এবং মধ্যস্বরের লোপ প্রবণতার ফলে দ্বিমাত্রিকতা দেখা দিল। এতে ধ্বনিপদ্ধতি সরল হল। এই সরলতা নিম্ননির্দিষ্ট ধারায় ঘটেছে—

(i) পদান্তে একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অ-কারের লোপ। যেমন- রাম্, কিন্তু গোবিন্দ।

(ii) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যস্বরের লোপ। যেমন- হল্দি, গাম্ছা।

(iii) 'ই', 'উ' ধ্বনির অপিনিহিতি। তারপর অপিনিহিত 'উ' > 'ই'। তারপর এই ধ্বনির লোপ অথবা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে সন্ধি। আধুনিক বাংলার প্রাক্কালে এই সন্ধিবদ্ধ অপিনিহিত স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির অভিশ্রুত পরিবর্তন। এই ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের উদাহরণ- অপিনিহিত ঃ কালি > কাইল, মারি > মাইর। অপিনিহিত ধ্বনির লোপ ঃ কালি > কাইল > কাল, মাগু > মাউগ > মাগ। অপিনিহিত উ > ই, এবং এই ই ধ্বনির লোপ ঃ ধাতু > ধাউত > ধাইত > ধাত, চাউল > চাইল > চাল। অপিনিহিতি জাত অথবা অন্য দ্বিস্বরের সন্ধি ঃ করিয়া > কইরা > কর্যা। সন্ধির অথবা লোপের পর অভিশ্রুতি ঃ করিয়া > কইরা > * করা > কর্যা > কোরে।

(খ) সাধু ও চলিত ভাষায় ঢ়-কারের এবং 'ন্হ', 'ম্হ' এই দুই নাসিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতা লোপ। যেমন - বুঢ় > বুড়, আহ্মার > আমার।

(গ) পদান্ত অ-কারের ক্রমবর্ধমান লোপ প্রবণতা। যেমন— ভাত > ভাৎ।

(ঘ) '-ইআ' > এ্যা, -এ; -উআ > -ও। যেমন — বানিয়া > বান্যা > বেনে, সাথুয়া > সেথো।

(ঙ) [-ইউ] অন্ত কর্মভাব-বাচ্যের অনুজ্ঞার লোপ।

(চ) [-ইল] এবং [-ইব] অন্ত ক্রিয়াপদের সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ।

(ছ) 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক কালের বহুল প্রয়োগ।

(জ) সংস্কৃত তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার। যেমন— অনুব্রজি, নমস্করিলা, প্রবর্তিতে।

(ঝ) বহু পরিমাণে আরবি-ফারসি, কিছু পরিমাণে তুর্কি এবং শেষের দিকে পর্তুগিজ শব্দের প্রবেশ।

(ঞ) বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার।

২.৪.২.৩ আধুনিক বাংলা

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার আধুনিক স্তরের যাত্রারম্ভ। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য—

(ক) লেখার ভাষা মৌখিক ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সাধু ভাষা রূপে সাহিত্যের একমাত্র বাকরীতি হয়ে দাঁড়াল। অন্ত্যমধ্য বাংলার অনুরূপ লেখ্যভাষা-কথ্যভাষার পদের মিশ্রণ আর থাকল না।

(খ) পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় পদমধ্যবর্তী পাশাপাশি দুই স্বর (অপিনিহিত অথবা মৌলিক) সন্ধিবদ্ধ হল এবং শেষ স্বরের পরিবর্তন ঘটল। যেমন — করিয়া > কইর‍্যা > করে, বইস > বস।

(গ) উনিশ শতকে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায় সাধারণভাবে স্বরসংগতি প্রতিষ্ঠিত হল। যেমন— জলুয়া (= জলবৎ) > জলো।

(ঘ) সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। যেমন— দান করা, পান করা, গমন করা ইত্যাদি।

(ঙ) ফারসি 'ব' (Wa)- জাত অব্যয় 'ও' শব্দ পদের এবং বাক্যের সংযোজকরূপে ব্যবহার। যেমন— রাম ও শ্যাম।

(চ) নঞর্থক 'ন' শব্দের সমাপিকা ক্রিয়াপদের আগে না বসে পরে বসা। যেমন— ম.বা.'না জাইহ' > আ.বা.যাইও না।

(ছ) সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি মাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ।

(জ) অষ্টাদশ শতকে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ গৃহীত হয়েছিল। উনিশ শতকে তা কমতে শুরু করল এবং ইংরেজি শব্দ ও ইডিয়ম গৃহীত হতে লাগল। এই শতকের গোড়াতেই কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বাংলায় এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে সেগুলিকে বিদেশী শব্দ রূপে চেনা যায় না। যেমন- আপিল (Appeal),লাট (Lord), লণ্ঠন, বেঞ্চি ইত্যাদি।

(ঝ) আধুনিক বাংলায় গদ্যরীতির প্রচলনের ফলে গদ্যের প্রসার পদ্যকে ম্লান করেছে। ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে দিগন্তেরও দৃষ্টির পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

আত্ম- সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

কোন কোন লক্ষণের বিচারে বাংলা ভাষা অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষাসমূহ থেকে স্বতন্ত্র? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) মগধীয় ভাষাগুচ্ছ বলতে কী বোঝায়? মগধীয় ভাষাগুলির উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(গ) প্রাচীন বাংলা ও আধুনিক বাংলার বিশেষত্বসমূহ চিহ্নিত করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

২.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। এবারে এই আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যাক। মগধীয় ভাষাগুচ্ছের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে

গিয়ে আমরা জেনেছি যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপে ভাঙনের ফলে তিনটি আঞ্চলিক ভাষারূপের সৃষ্টি হয়েছিল, যে ভাষা অশোকের সমসাময়িক কালে চারটি আঞ্চলিক উপভাষায় বিভক্ত হয়েছিল। অশোক অনুশাসনের প্রাচ্যা শাখার পূর্বী উপশাখা থেকে সাহিত্যিক প্রাকৃতের সময়ে মাগধী প্রাকৃতের জন্ম হয়। এই মাগধী প্রাকৃতের সরলীকৃত অপভ্রংশ রূপ থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিকে সাধারণভাবে যে ছয়টি ভাষার জন্ম হয় সেগুলিকে একযোগে মগধীয় ভাষাগুচ্ছ বলে।

বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ছোটোনাগপুরের কিছু অঞ্চলে মগধীয় ভাষার বিস্তার। মগধীয় ভাষাগুলির মধ্যে মগহি সাহিত্যশূন্য, বাকি পাঁচটি ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য রয়েছে। আমরা মগধীয় ছয়টি ভাষার প্রত্যেকটির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিরূপণ করেছি।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির আলোচনায় দেখা গেল প্রাকৃত-অপভ্রংশের স্তরে যে সমস্ত আঞ্চলিক রূপভেদ ছিল সে সমস্ত রূপভেদ থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় আরো আঞ্চলিক রূপভেদের ফলেই নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আমরা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছি।

আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষা উদ্ভূত হয়েছে। অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্য ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ এবং বাংলা ভাষার অন্যূন হাজার বছরের ইতিহাসের তিনটি স্তরের বিশেষত্বসমূহ আমরা চিহ্নিত করেছি।

২.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

অশোক অনুশাসন : মহামতি অশোক ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ প্রয়োজনে আদেশ-নির্দেশবহ যে সকল বাণী বিভিন্ন পৃষ্ঠ-ভূমিতে খোদিত করে তাঁর সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রচার করেছিলেন, তা 'ধর্মলিপি' (ধম্মলিপি, ধম্মদিপি) নামে আখ্যাত হলেও সাধারণভাবে এগুলোকেই 'অশোক অনুশাসন' বলা হয়ে থাকে।

২.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। মাগধী বর্গীয় ভাষা বলতে কী বোঝায়? ভাষাগুলির নাম উল্লেখ করুন। মগধীয় ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করুন। এই সূত্রে চর্যাগীতির ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলের দাবির যৌক্তিকতা বিচার করুন।

২। প্রাচীন বাংলার কালসীমা, নিদর্শন ও লক্ষণগুলি নির্দেশ করুন।

৩। বাংলা নব্যস্তরের ভাষা হলেও প্রাচীন বাংলায় বেশ কিছু পূর্ববর্তী স্তরের ভাষালক্ষণ দেখা যায়। ---এবিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। বাংলা ভাষার মধ্যযুগকে আদি ও অন্ত্যমধ্য পর্বে বিন্যস্ত করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করুন। ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ও শব্দব্যবহার বিচার করে আলোচনা বিশদ করুন।

৫। মধ্য বাংলার লক্ষণসমূহ উল্লেখ করুন।

৬। মাগধী প্রাকৃতজাত ভাষাগুলির নাম উল্লেখ করে এবং এদের প্রচলনস্থান, ইতিহাস ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করুন।

৭। প্রাচীন বাংলার বিশেষত্ব ও লক্ষণসমূহ বিশদ করুন।

৮। মগধীয় ভাষাগুচ্ছের প্রত্যেকটি ভাষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২.৮ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৩
বাংলা শব্দভাণ্ডার

বিষয় বিন্যাস

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ

৩.২.১ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ

৩.২.১.১ তৎসম

৩.২.১.২ অর্ধতৎসম

৩.২.১.৩ তদ্ভব

৩.২.১.৩.১ প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তদ্ভব

৩.২.১.৩.২ দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব

৩.২.১.৩.৩ অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব

৩.২.১.৩.৪ ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব

৩.২.১.৩.৫ মোঙ্গল গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব

৩.২.১.৩.৬ উপভাষায় প্রচলিত তদ্ভব

৩.২.২ আগন্তুক শব্দ বা কৃতঋণ শব্দ

৩.২.২.১ দেশী শব্দ

৩.২.২.২ বিদেশী শব্দ

৩.২.২.২.১ ফারসি শব্দ

৩.২.২.২.২ ফারসি মাধ্যমে আরবি শব্দ

৩.২.২.২.৩ ফারসি মাধ্যমে তুর্কি শব্দ

৩.২.২.২.৪ ফারসি প্রত্যয় ও উপসর্গ

৩.২.২.২.৫ পর্তুগিজ শব্দ

৩.২.২.২.৬ ওলন্দাজ শব্দ

৩.২.২.২.৭ ফরাসি শব্দ

৩.২.২.২.৮ ইংরেজি শব্দ

৩.২.২.২.৯ অনুদিত ঋণ

৩.৩ পালিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ

৩.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৩.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৩.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

ভাবপ্রকাশের বাহন হল ভাষা। আর ভাষার একমাত্র উপাদান তার শব্দভাণ্ডার। যে ভাষার শব্দশক্তি যত উন্নত, শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ, সেই ভাষাই বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসন লাভ করেছে। বস্তুত ভাষার মুখ্য সম্পদই তার শব্দভাণ্ডার। যে কোনো ভাষায় শুধু শব্দজ্ঞানের সাহায্যেই কাজচালানো, মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব। শব্দরাশি শুধু ভাবপ্রকাশের উপাদান মাত্র নয়, এর মধ্যদিয়ে একটি জাতির আচার, আচরণ, গতিবিধি, সভ্যতা ও সংস্কার -- এক কথায় তার প্রাণরহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

শব্দশক্তির প্রধান উৎস দুটি - ধাতুতে অথবা শব্দে প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ নির্মাণ এবং অপর ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ। প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত এবং গ্রিকভাষা নতুন শব্দ নির্মাণ শক্তিতে অতুলনীয়। আধুনিক ইংরেজি ভাষা বিদেশী শব্দ আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে অপরাজিত। আর এই উভয় উৎস থেকে শব্দশক্তি সঞ্চার করে বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি অন্য ভাষাভাষী অধিবাসীদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় আর্যগণ অনেক নতুন বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং সে সমস্ত ভাষার শব্দ গ্রহণ করেছিল। আর্যরা ভারতে আসার পর নতুন পরিচিত বস্তু বা প্রাণীর নাম অনার্য ভাষাসমূহ থেকে গ্রহণ করেছিল। যেমন - কদলী, তাম্বুল, গণ্ড। কালক্রমে অনেক পরিচিত বস্তুর অনার্য নামও আর্যভাষায় গৃহীত হয়েছিল। যেমন - মীন, তোয়, কম্বল ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দকোষে এমন অনেক আর্যিভূত অনার্য শব্দ রয়েছে।

প্রত্যেক ভাষার প্রধান অবলোকন তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দসমূহ। তারপর সেই ভাষা একদিকে যেমন নবসৃষ্ট শব্দের সাহায্যে এবং অন্য ভাষা থেকে ঋণ গ্রহণ করে তার শব্দসম্ভার বাড়িয়ে চলে, তেমনি অনেক সময় প্রয়োজনে বা কোনো অজ্ঞাত কারণে অনেক শব্দ ভাষা থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা তথা প্রাকৃত-আবহট্টের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা জন্ম লাভ করেছে, তাই প্রাকৃত মাধ্যমে বিবর্তিত তদ্ভব শব্দ গুলিই বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। তৎসম শব্দসমূহ তদ্ভব শব্দের মতোই সমান গুরুত্ব ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। বস্তুত যে কোনো তৎসম শব্দকেই আমরা বাংলা শব্দ বলেও মনে করি। তবে পরিবর্তনশীল সমাজে অনেক সময় কোনো কোনো প্রাচীন শব্দও বর্জিত হয়। যেমন প্রাচীন ভারতের যজ্ঞব্যবস্থা লোপ পাওয়ায় তৎসম্পর্কিত অনেক শব্দও লুপ্ত হয়েছে। বাংলা দেশে

মুসলমানের আগমনের পর আরবি-ফারসি শব্দের প্রাবল্যহেতু কিছু কিছু খাঁটি বাংলা শব্দ বা তদ্ভব শব্দও বর্জিত হয়েছে। যেমন — 'উদ্যান' স্থানে ফারসি 'বাগান', 'বুহিত্র' স্থলে 'জাহাজ' ইত্যাদি। এইভাবেই গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে কোনো একটা দেশের শব্দসম্পদ গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে তার ভাণ্ডার পুষ্ট হতে থাকে। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষাতেও নানা দেশী-বিদেশী শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণই সর্বপ্রথমে শব্দের শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বর্তমান বিভাগে আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা শব্দ ভাণ্ডার। ভাষার সম্মান তার প্রকাশ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গভীর অনুভুতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশ ক্ষমতার মূল আশ্রয় তার শব্দ সম্পদ। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলা শব্দভাণ্ডার কেন্দ্রিক আলোচনাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যাতে —

- আপনারা বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের উৎসগত শ্রেণিবিভাগকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মৌলিক এবং আগন্তুক শব্দ দ্বারা বাংলা শব্দভাণ্ডার কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- বিদেশী শব্দের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগের আলোচনার মাধ্যমে আপনারা সেইসব শব্দের বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৩.২ বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ

ভাষার শব্দসম্পদ তিনটি উপায়ে সমৃদ্ধ হতে পারে— উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, অন্যভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে এবং নতুনসৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। আজকের উন্নত বাংলা ভাষাও এই ত্রিবিধ উপায়ে নিজের শব্দ ভাণ্ডারকে উৎগত বিচারে ভাষাবিজ্ঞানীগণ প্রথমত দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছেন — মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ এবং আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ। মৌলিক শব্দগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে— তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব। আগন্তুক শব্দের প্রধান দুটি ভাগ দেশী ও বিদেশী শব্দ। মৌলিক শব্দজাত তদ্ভব শব্দ এবং আগন্তুক শব্দজাত বিদেশী শব্দের বেশ কিছু উপবিভাগও রয়েছে।

৩.২.১ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ

যে সব শব্দ মূল ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে গৃহীত অথবা আগত এগুলিই বাংলা মৌলিক শব্দ। এই উত্তরাধিকার লব্ধ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয় - তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব ।

৩.২.১.১ তৎসম

যে সব শব্দ সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিতভাবে আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় তৎসম শব্দ ('তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃতের 'সম' অর্থাৎ অভিন্ন মূর্তি)। যেমন - জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, গৃহ, কৃষ্ণ, অন্ন, সূর্য, মিত্র,জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের অনুপ্রবেশ বাংলা ভাষার আদিস্তরেই শুরু হয়েছিল। তবে বিশেষত উনিশ শতকে পণ্ডিতি প্রভাবের ফলে সাধুগদ্যে তৎসম শব্দ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে গৃহীত হয়েছিল। উচ্চতর জীবন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আদি বিষয় বৈচিত্র্য প্রকাশে সংস্কৃত শব্দসম্পদ বাংলা ভাষার পক্ষে অপরিহার্য। সংস্কৃত ব্যাকরণের কল্যাণে সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি সুনির্দিষ্ট থাকায় নতুন শব্দগঠন পদ্ধতিও বাংলায় এক সহজসাধ্য প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্যহয়েছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে বলা চলে 'প্রকৃত তৎসম'। ---- পিতা, অন্ন, ভূমি। বাংলা ভাষায় এমন অনেক তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেগুলো বানানে সংস্কৃত হলেও উচ্চারণের দিক থেকে প্রাকৃত বা বিকৃত, এগুলোও তৎসম-পর্যায়ভুক্ত; কিন্তু এদের উচ্চারণ বিকৃতি লক্ষ ক'রে কেউ কেউ এদের 'বিকৃত তৎসম' আখ্যা দিয়ে থাকেন। ---কৃষ্ণ (ক্রিশন্), সহ্য (শোজ্ঝ), জ্ঞান (গ্যাঁন) প্রভৃতি। কথ্য সংস্কৃতে প্রয়োগ ছিল অথচ ব্যাকরণ-অভিধানে সমর্থন নেই, এমন কিছু কিছু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, এদের বলা চলে 'অসিদ্ধ তৎসম'। — 'অন্ধল, কৃষাণ, নবল' প্রভৃতি। সাধু এবং চলিত বাঙলায় তৎসম ও তদ্ভব — উভয় রূপেই প্রতীয়মান হয় অথচ ধ্বনিপরিবর্তন-সূত্রে এদের কোনো পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়, এমন সব শব্দকে 'প্রতীয়মান তৎসম' শব্দ বলা চলে। — 'জল, রস, দশ, বন' প্রভৃতি।

এদের নামের ক্ষেত্রে 'তৎসম' শব্দটির পূর্বে বিভিন্ন বিশেষণ যুক্ত হলেও সাধারণভাবে পূর্বোক্ত যাবতীয় শব্দকেই 'তৎসম' রূপে অভিহিত করা হয়। একালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারহেতু এবং পারিভাষিক প্রয়োজনে বহু নতুন শব্দ সৃষ্ট হচ্ছে সেগুলি

সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে সিদ্ধ। এ জাতীয় পারিভাষিক অথবা নবসৃষ্টি শব্দ, কখনো বা 'অনুদিত ঋণ' (translation lone-word) শব্দগুলোকেও 'তৎসম'- রূপে স্বীকার না করবার কোনো হেতু নেই। — 'বিশ্ববিদ্যালয়, শীর্ষ সম্মেলন, গলবন্ধ, অধ্যাদেশ, অনুদান, অপিনিহিত, অভিশ্রুতি, প্রভৃতি।

(ভাষাবিদ্যাপরিচয় : পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য)

৩.২.১.২ অর্ধতৎসম

যে সমস্ত শব্দ একসময় সংস্কৃত থেকে অবিকলভাবে বাংলায় গৃহীত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী কালোচিত ধ্বনিপরিবর্তন এড়াতে পারেনি,যে সকল শব্দকে বলা হয় অর্ধতৎসম শব্দ। কথ্যভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট রয়েছে। যেমন-

কৃষ্ণ > কেষ্ট (কানু)

চিত্র > চিত্তির (ঃচিতা)

শ্রদ্ধা > ছেদ্দা (ঃ সাধ)

বৈদ্য > বদ্দি (ঃ বেজ)

জ্যোৎস্না > জোছ্না (ঃ জোনাকি)

রক্ত > রকত (ঃ রাতা)

রাত্রি > রাত্রির (ঃ রাত)

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম উভয়জাতের শব্দই সংস্কৃত থেকে আগত কালোচিত বিকৃতিপ্রাপ্ত। পার্থক্য শুধু এই যে তদ্ভব শব্দগুলি প্রাকৃত স্তরেই বিকৃত হয়েছিল, তারপর আরও বিকৃতি সহযোগে বাংলায় গৃহীত হয়। তদ্ভব শব্দ প্রাকৃত মাধ্যমে আগত, অর্ধতৎসম সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় প্রাপ্ত। একই শব্দের তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম দ্বিবিধ রূপও বাংলায় যথেষ্ট প্রচলিত।

তৎসম		অর্ধতৎসম		তদ্ভব
কৃষ্ণ	=	কেষ্ট	=	কানু
গৃহিণী	=	গিন্নি	=	ঘরণী
চন্দ্র	=	চন্দর	=	চাঁদ

অনেক সময় দেখা যায় যে একই শব্দের অর্ধতৎসম ও তদ্ভব দুইরূপ অথবা তদ্ভব শব্দের দুই রূপান্তর যমজ শব্দ হিসাবে বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত আছে। যেমন -

শ্রদ্ধা > সাধ, ছেদ্ধা

ক্ষার > খার, ছার

ক্ষুদ্র > খুদ,খুড়া

কক্ষ > কাছ, কাঁখ

কখনো স্বগোত্র ছাড়া অন্য ভাষার শব্দও যমজরূপে পাওয়া যায়। ফারসি ভাষার কিছু শব্দ --

মুদ্রা ; মোহর

বাহু : বাজু

চাকা : চরখা

সপ্তাহ : হপ্তা

শরৎ : সাল

উপরের উদাহরণগুলিতে দ্বিতীয় শব্দকটি পারসি।

দেব : দেও (হিন্দি)

গোলাপ ঃ জোলাপ (দুই-ই ফারসি)

বাংলা সাধুভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার প্রায় নিষিদ্ধ হলেও কথ্য ভাষায় এর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন — ধাষ্টামো, পেল্লায়, বোষ্টম, সোমত্ত, আদিখ্যেতা, হ্যাপিত্যেশ ইত্যাদি।

৩.২.১.৩ তদ্ভব

যে সমস্ত শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার ভিতরদিয়ে ধারাবাহিক পরিবর্তনে প্রক্রিয়ায় বাংলা রূপ লাভ করেছে, সেগুলিই তদ্ভব শব্দ। 'তৎ' অর্থাৎ মূল স্থানীয় ভাষা সংস্কৃত থেকে যার 'ভব' অর্থাৎ রীতিমতো উৎপত্তি। সংস্কৃত থেকে আগত তদ্ভব শব্দগুলিই বাংলা শব্দভাণ্ডারের আদি মূলধন। অবশ্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা অন্যান্য গোষ্ঠী কিংবা দ্রাবিড়, ভোটচিনীয়, অস্ট্রিক ইত্যাদি অনার্য ভাষাগোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে গৃহীত কিছু শব্দের তদ্ভব রূপও বাংলায় প্রচলিত আছে।

আত্ম-সমীক্ষমূলক প্রশ্ন

বাংলা শব্দভাণ্ডারে উৎসগত শ্রেণিবিন্যাস কী রকম? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

একটি ভাষার সমৃদ্ধির পেছনে সেই ভাষার শব্দসম্পদের ভূমিকা কী? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

মৌলিক শব্দ কাকে বলে? (৩০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

বাংলা শব্দভাণ্ডারে কিছু শব্দকে কেন 'অসিদ্ধ তৎসম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে? (২৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম শব্দসমূহের মধ্যে মূল পার্থক্য কী? (২৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

তদ্ভব শব্দকে দটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় নিজস্ব ও কৃতঋণ তদ্ভব। যে সমস্ত তদ্ভব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলস্বরূপ এসেছে সেই শব্দ গুলিকে নিজস্ব তদ্ভব বলা যায় যেমন -

ইন্দ্রাগার > ইন্দ্রাআর > ইন্দারা

উপাধ্যায় > উবজ্ঝঅ>ওঝা ইত্যাদি।

আর যে সমস্ত শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ হিসাবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে। পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে সে সব শব্দকে কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশী তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্য ভাষা থেকে গ্রিক দ্রাখ্‌মে > বাংলা দাম।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ ভিন্ন অন্য বংশ থেকে —

দ্রাবিড় বংশের তামিল পিল্লৈ > বাংলা পিলে ইত্যাদি।

৩.২.১.৩.১ প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তদ্ভব

সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা

ষোড়শ > সোলহ > ষোল

রাজ্ঞিকা > রণ্ণিআ > রানি

খাদ্য > খজ্জ > খাজা

ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইঁদারা

অর্ধতৃতীয় > অড়ঢতইঅ > আড়াই

নপ্তৃক > নত্তিঅ > নাতি

কফোণিকা > কহাণিতা > কনুই

গায়তি > গাঅই > গায়

পততি > পডই > পড়ে

একাদশ > এগ্‌গারাহ > এগারো

অবিশতি > আইসই > আসে

কর্ম > কম্‌ম > কাম

অদ্য > অজ্জ > আজ

কন্টক > কন্টঅ > কাঁটা

৩.২.১.৩.২ দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব

দ্রাবিড় > সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা

তামিল ইরবু >* ইঞ্চক > * ইঞ্চঅ > * ইচলা (মাছ)

(iravu)

তামিল উলবৈ > উলুপ > উলুঅ > উলু (খড়)

(ulavai = ঝোপ)

তামিল কুলকম > কুটপ > কুডব > কুড় (বিঘা)

(Kulakam = কঠিন ও তরল পদার্থের মান)

তামিল পিল্লৈ > পিল্লিক > * পিল্লিঅ > পিলে (ছেলেপিলে)

(Pillai = শাবক

তামিল পিল্লৈ > পিল্লিক > * পিল্লিঅ > পিলে (ছেলেপিলে)

কানাড়ি কোড > ঘট > ঘড়া

(তামিল মালয়ালি কুটম্)

তামিল মুটে > মুকট > মুডঅ > মোট (বোঝা)

তামিল কাল্ > খল্ল > খল্ল > খাল

৩.২.১.৩.৩ অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব

সং. ঢৌকয়তি > প্রা. ঢুক্কই > বাং. ঢোকে

সং. ঢক্ক > প্রা. ঢক্ক > বাং. ঢাকা

সং. টঙ্ক উচ্চস্থান > প্রা টঙ্ক > বাং. টঙ্গ

এই জাতীয় কিছু শব্দ অস্ট্রিক থেকে এসেছে বলে ধারণা হলেও এগুলির মূল রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। যেমন - উচ্ছে, ঝিঙ্গা, খোকা, খুকি, ডেঙ্গা, খড়, খুঁটি, ঢিল, ঢিপি, ইত্যাদি।

৩.২.১.৩.৪ ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব

ইন্দো-ইউরোপীয়	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা
গ্রিক দ্রাখ্মে	> দ্রম্য	> দম্ম	>দাম
(Drakhme = মুদ্রাবিশেষ)			
গ্রিক সুরিংস	> সুরুঙ্গ	> সুরুঙ্গ	> সুঙ্গ
(Surinks)			
গ্রিক সেমিদালিস্	> সমিতা	> সমিতা	> সিমুই

(Semidalis = ময়দা)

প্রাচীন পারসিক মুদ্রায়	> মুদ্র (মিশর	> মুদ্দ	> মুদ্রা
(= ময়দা)	(মিশর দেশীয় সীলমোহর)		
প্রাচীন পারসিক কর্শপণ	> কার্ষাপদ	> কহাবন	> কাহন
(বস্তুমান বিশেষ)	(মুদ্রা বিশেষ)	= খড়, কড়ি	
			ইত্যাদি গণনার
			সংখ্যা

৩.২.১.৩.৫ মোঙ্গল গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব

তুর্কি তিগির	> সং. ঠক্কুর	> প্রা. ঠক্কুর > বাং. ঠাকুর
তুর্কি তুর্ক	> প্রা. তুরুক্ক	> বাং. তুরুক (সওয়ার)

৩.২.১.৩.৬ উপভাষায় প্রচলিত তদ্ভব

শিষ্ট কথ্যভাষায় প্রচলিত তদ্ভব শব্দসমূহ অনেক সময় সাধুভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষা ও বিভাষায় প্রচলিত অসংখ্য খাঁটি তদ্ভব ও কিছু অর্ধতৎসম শব্দ রয়েছে। এইজাতীয় শব্দগুলির মধ্যে আছে----- আইছাল, আইশটাল (<আমিষতাল = এঁটোকাঁটা পেলবার আস্তাকুঁড়), আজিমা (<আর্যিকামাতা = মাতামহী), আলুন্দা, আলধুনা ((<আলন্ধুম = ঝুল), উঘার (<উদ্ধার্গার = উচ্চ মাচা), উরস (<উদ্দংশ = ছারপোকা), খাড় (<খণ্ড = গুড়), গান্দা (<গন্ধ = পচাবাসি অর্থে গন্ধযুক্ত), ছেপ (<ক্ষেপ = থুতু), জাম্বুরা (<জম্বীর = বাতাবী লেবু), জেওয়াস (<জ্যৈষ্ঠশাস = বড়শ্যালিকা), দোনা (<দ্রোণ / <দোহন = দোহনপাত্র), ননাস (<ননদশাস = বড় ননদ), নায়র (<জ্ঞাতিগৃহ = কুটুম্বিনী), পতাপর (<প্রভাত = প্রহর), প্যাকনা (<ব্যাখ্যানা = বাজে আব্দার), বরই (<বদরী = কুল), বয়রা (<বধিরা = কানে কালা), ভোগাচানি (<বুভুক্ষাচ্ছন্ন = অতিশয় ক্ষুধাপীড়িত), মাইচ্যা (<মঞ্চিকা = চেয়ার) , মোচ (<শ্মশ্রু), লেঞ্জুয়া (<লঞ্জউয়া = ভাম), শিঙ্গারা (<শৃঙ্গাটক = পানিফল), হাচান (<সঞ্চান = বাজপাখি), হলট (<হলবর্ত্ত = মেঠোপথ), হাঞ্জুর (<সম্+Vযুজ্+Vকৃ = একত্রীভূত ক'রে) ইত্যাদি।

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) তদ্ভব শব্দসমূহ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে?

(সংকেত সূত্র ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

৩.২.২ আগন্তুক শব্দ বা কৃতঋণ শব্দ

যে সমস্ত বাংলা শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে কিংবা তৎসমরূপে অবিকলভাবে আসেনি, অথবা সংস্কৃতে গৃহীত হয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলায় আসেনি অর্থাৎ সরাসরি অন্য ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে, সেই সকল শব্দকে আগন্তুক শব্দ বলে।

আর্যভাষা বহির্ভূত অথবা ভিন্ন গোত্রজ আর্যভাষা থেকে যে সকল শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়ে কালোচিত পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় স্থান লাভ করেছে তাদের আর আগন্তুক শব্দ বলা হয় না। সেগুলি তৎসম কিংবা তৎসম শব্দরূপেই বাংলায় বিবেচিত হয়ে থাকে। যে সকল ভাষা থেকে সমস্ত শব্দ সরাসরি বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেলিকেই শুধু আগন্তুক শব্দ বলা হয়। আগন্তুক শব্দকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে দেশী শব্দ ও বিদেশী শব্দ।

৩.২.২.১ দেশী শব্দ

যে সমস্ত আগন্তুক শব্দ ভারতের বাইরে থেকে আসেনি, বাংলা দেশে আর্যভাষা আগমনের পর যে সকল স্থানীয় আর্যতর ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে সেগুলিই দেশী শব্দ।

ভারতের অধিবাসীদে একটা বড় অংশ কোনো আর্যভাষায় কথা বলে না। আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল নিজেদের ভাষা নিয়ে। এদের মধ্যে প্রধান দুটি গোষ্ঠী হচ্ছে -- দ্রাবিড় এবং নিষাদ বা অস্ট্রিক গোষ্ঠী। এদের ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলায় সরাসরি গৃহীত হয়েছে সেগুলিই প্রকৃত দেশী শব্দ। যেমন - ডিঙ্গি, ঢোল ঢাল, ডাঙ্গা, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢিল, ঢেউ, ডাব, ডাহা, ঢেঁকি, কুলা ইত্যাদি।

৩.২.২.২ বিদেশী শব্দ

ভারতের বাইরের এবং ভারতীয় আর্য শাখা বহির্ভূত যেসব শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এগুলিই বিদেশী শব্দ।

বাংলা ভাষা অন্য যে সমস্ত ভাষার কম-বেশি সম্পর্ক-সান্নিধ্যের ফলে বিদেশী শব্দ সঞ্চয় করেছে সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে ফারসি এবং ফাসির মারফৎ অল্প তুর্কি ও প্রচুর আরবি শব্দ, পর্তুগিজ শব্দ এবং কিছুপরিমাণে ওলন্দাজ ও ফরাসি শব্দ; এবং বিশেষভাবে ইংরেজি শব্দ।

বাংলাদেশে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মুসলমান শাসনের সময় শাসকদের ফারসিভাষা বাংলায় প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবেশ করেছে। বাংলায় প্রায় আড়াই হাজার ফারসি শব্দ কিংবা ফারসি মারফৎ আরবি ও তুর্কি শব্দ এসেছে। ষোড়শ শতকের

শেষ দিক থেকে, বিশেষ করে মোগল শাসনের সূত্রপাতের পর থেকে এই জাতীয় শব্দের প্রবেশ বৃদ্ধি পায়, অষ্টাদশ শতকের বাংলায় ফারসির প্রভাব সর্বাধিক। উনিশ শতকে ফারসির পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা যখন আইন আদালতের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বাংলায় ফারসির প্রভাব ক্রমে হ্রাস পেল। তবু এই আগন্তুক শব্দগুলি বাংলা ভাষার অতি প্রয়োজনীয় শব্দ। এগলি ছাড়ও শতাধিক পর্তুগিজ শব্দ, কিছু ফরাসি শব্দ এবং ওলন্দাজ শব্দ বাংলায় এসেছে।

বাংলায় অনেক ফারসি শব্দ তদ্ভব শব্দের স্থানও গ্রহণ করেছিল। যেমন - 'বায়ু' আর্যের প্রাচীন তদ্ভব শব্দ 'বা' এখন অপ্রচলিত, আরবি 'হাওয়া' ও ফারসি 'বাতাস' তার স্থান গ্রহণ করেছে। তেমনি তদ্ভব 'রাতা' (<রক্ত) স্থানে আরবি 'লাল', তদ্ভব 'ভুঁই' (<ভূমি) ও 'খেত' (<ক্ষেত্র) শব্দের জায়গায় পারসি 'জমি' প্রযুক্ত হয়েছে। অনেক বিদেশী শব্দের দ্বারা বিতারিত দেশী শব্দের এখন আর চিহ্ন পাওয়া যায় না। যেমন - গরম, গরজ, নরম, পছন্দ, হাজার , বিদায়, বদলা, মশলা ইত্যাদি।

৩.২.২.২.১ ফারসি শব্দ

আমরা আমাদের আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় প্রচুর ফারসি শব্দের (প্রায় আড়াই হাজার) অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কেবল শব্দ সংখ্যা নয়, ফারসি শব্দাবলির বিষয় বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। এই শব্দগুলির অধিকাংশই রাজা, রাজ-দরবার, যুদ্ধ ও শিকার, আইন-আদালত, রাজস্ব ও প্রশাসনবিষয়ক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, কলা, প্রাকৃতিক বস্তু বা দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত। যেমন -

রাজ-দরবার, যুদ্ধ ও শিকার সংক্রান্ত — "আমীর, ওমরা, উজীর, খেতাব, খেলাৎ, খাস, তক্ত, তাজ, দরবার, দৌলত, নকীব, বাদশা, মালিক, হুজুর; সোয়ার, সেপাই, কুচ, কাওয়াজ, কাবু, তাঁবু, তোপ, দুশ্‌মন, বাহাদুর, রসদ, রেসালা; শিকার, বাজ, বাহাদুর, হিম্মৎ" ইত্যাদি।

আইন-আদালত, রাজস্ব ও শাসন সংক্রান্ত শব্দ— "আদম-শুমারী, আবাদ, আসামী, এস্তেমরারী, এক্তিয়ার, ওয়াসীল, কসবা, খাজনা, খারিজ, গোমস্তা, জমা, জমি, তহসীল, তালুক, দারোগা, দপ্তর, নাজির, পিয়াদা, ফিরিস্তি, বীমা, মহকুমা, মোহর, রায়ত, শহর, সন, সরকার, হদ্দ, হিসাব, হিস্‌সা; অকু, অছিলা, আইন, আদালৎ, ইশাদী, উকীল, এজাহার, ওজর, কসুর, কানুন, ক্রোক, জবানবন্দী, জব্দ, জারি, জেরা, তকরার, তামিল, দলীল, দস্তখত, নাবালক, নালিশ, পেশা, ফেরার, বহস, বাজেয়াপ্ত, মোকদ্দমা, মন্‌সেফ, রদ, রায়, রুজু, শনাক্ত, সালিস, হক, হাকিম, হেফাজৎ" ইত্যাদি।

মুসলমান-ধর্ম-সম্বন্ধীয় শব্দ — "অজু, আউলিয়া, আল্লা, ইঞ্জিল, ইমান, ঈদ, কবর, কাফের, কাবা, কোরবানী, গাজী, জবা, জেহাদ, জুম্মা তোবা (তওবা), দরগা, দরবেশ, দীন, দোয়া, নবী, নমাজ, নিকাহ, পয়গম্বর, ফেতেস্তা, বুজরুগ, মসজিদ, মোহরম,

মোমিন, মোল্লা, রসুল, শরিয়ৎ, শহীদ, শীরনী, শিয়া, হদীস, হালাল, হুরী" ইত্যাদি।

মানসিক সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও কলা সংক্রান্ত শব্দ — "আখুঞ্জী, আদব, আলেম, এলেম, কেচ্ছা, খত খোন্দার, গজল, কসীদা, মস্‌নবী, মুন্‌শী, বয়েত, শাগরেদ, সেতার, হরফ" ইত্যাদি।

সাধারণ সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ বিলাস, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক শব্দ — "অন্তর,আয়না, আচকান, আঙ্গুর, আতর, আতশ-বাজী, আরক, কাগজ, কুলুপ, কিংখাপ, কিশমিশ, কসাই, কাঁচী, খরমুজ, খাতা, খানসামা, খাসী, গজ, গোলাপ, চরখা, চশমা, চাপকান, চাবুক, চিক, জরী, জামা, জিন, তাপ্তা, তকমা, তাকিয়া, দালান, দস্তানা, দুরবীন, দোয়াত, পরদা, পাজামা, পোলাও ফরাস, ফানুস, বরফ,বরফী, বাগিচা, বাদাম, বারকোষ, বুলবুল, মখমল, ময়দা, মলম, মলা, মিছরী, মীনা, মুহুরী, মেজ, রিপু, রুমাল, রেকাব, রেশম, শানাই, শাল, শিশি, সিন্দুক, সোরাই, হাউই, হালুয়া, হুঁকা, হৌজ" ইত্যাদি।

বিদেশী জাতির নাম-বাচক শব্দ— "আরব, আরমানী, ইংরেজ, ইহুদী, কাফরী, হাবশী" ইত্যাদি। "হিন্দু" নামটিও মূলে ফারা (সংস্কৃত "সিন্ধু" শব্দের প্রাচীন পারসিক বিকার জাত)।

প্রাকৃতিক-বস্তু-বিষয়ক ও দৈনন্দিন-জীবন-সম্পৃক্ত শব্দ — "অন্দ, আওয়াজ, আব-হাওয়া, আসমান, আসল, ইয়ার, ওজন, কদম, কম, কায়দা, কারখানা, কোমর, খবর, খোরাক, গরম, গুজরান, চাঁদা, চাকর, জল্‌দী, জানোয়ার, জাহাজ, জিদ, তল্লাশ, তাজা, দখল, দম, দরকার, দরুন, দাগা, দানা, দোকান, নগদ, নমুনা, নেহাত, পেশা, পছন্দ, পরী, ফরসৎ, বজ্‌জাত, বন্দোবস্ত, বাহবা, বেকুব, মজবুত, মিঁয়া, মুল্লুক, মোরগ, কম, রোশনাই, সাদা, সাফ, হজম, হপ্তা, হাজার, হুজুগ, হুঁশিয়ার" ইত্যাদি।

৩.২.২.২.২ ফারসি মাধ্যমে আরবি শব্দ

বাংলা ভাষায় বেশ কিছু আরবি শব্দও ফারসি মাধ্যমে এসেছিল। এই শব্দগুলি ফারসির মাধ্যমে বাংলায় গৃহীত হওয়ায় কার্যত বাংলার পক্ষে এগুলিকে ফারসি শব্দ বলেই ধরতে হয়। যেমন - আইন, আক্কেল, হুকা, কেচ্ছা, খাসি, আয়েস, বিদায়, কেতাব, জিলা, আতর, তাজ্জব, দফা, কলম ইত্যাদি।

৩.২.২.২.৩ ফারসি মাধ্যমে তুর্কি শব্দ

ফারসি মাধ্যমে কিছু তুর্কি শব্দও বাংলায় প্রবেশ করেছিল। যেমন - আলখাল্লা, উজবুক, উর্দু, কাঁচি, কুলি, কাবু, চাকু, বিবি, বোঁচকা, চিঠি, কোর্মা, খাতুম, খাঁ, কানুম, চকমকি, তবক, দারোগা, বাবুর্চি, বাহাদুর, বেগম, মুচলেকা, লাল, সওগাত ইত্যাদি।

৩.২.২.২.৪ ফারসি প্রত্যয় ও উপসর্গ

প্রত্যয়

[-আনা] → বাবুয়ানা, সাহেবিয়ানা।

[-গিরি] বাবগিরি, কেরানিগিরি।

[-দার] বাজনদার, অংশীদার।

[-বাজ] মতলববাজ, ধড়িবাজ, হামলাবাজ, ফেরেববাজ।

[-সই] যুতসই, মাপসই, টেকসই।

[ফি-] ফিহপ্তা, ফিবছ।

[বে-] বেতমিজ, বেবন্দোবস্ত, বেহাত।

৩.২.২.২.৫ পর্তুগিজ শব্দ

ষোড়শ শতকে বাংলায় পর্তুগিজদের বাণিজ্য শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মিশনারিদের কার্যকলাপের দ্বারা বাংলার সঙ্গে তাদের যোগ বজায় ছিল। পর্তুগিজরা অনেক নতুন বস্তু এদেশে এনেছিল যেগুলির পর্তুগিজ নামও বাংলায় প্রচলিত হয়েছে। বাংলায় গৃহীত পর্তুগিজ শব্দগুলির মধ্যে নতুন বস্তুর পরিচায়ক শব্দই প্রধান। এরকম বেশ কিছু শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বাংলায় কিছুটা পরিবর্তিত রূপে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে অনেক সময় এদের বিদেশী শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই শব্দগুলির মধ্যে আছে কাবার (acabar), আলকাতরা (alcatrao), আলপিন (alfinete), আনারস (ananas শব্দটি মূলে দক্ষিণ আমেরিকার), নোনা (anona), আতা (ata), আলমারি (almario), বালতি (balde), বোতাম (botao), বাসন (bacis), বোমা (bomba), ওলন্দাজ (hollandais), কামিজ (camisa), কেরানি (cerane), চাবি (chave), কপি (cauve), ফিতা (fita), ফাল্‌তো (falto), গামলা (gamela), গস্ত (gasto), গরাদে (grade), গুদাম (gudo), শব্দটির মূলে আছে মালয় gudang অথবা তেলুগু gidangi, গীর্জা (gireja), জানালা (janela), নীলাম (leilao), মার্কা (marca), মিস্ত্রি (mestra), পাঁউ (রূটি) (pao), পেঁপে (papaia শব্দটি মূলে আমেরিকার), পাচার (passar), পেয়ারা (pera), পিপা (pipa), পরাত (prats), পেরেক (prego), রেস্ত (resto), সাবান (sabao), সাবু বা সাগু (sago), সায়া (saia), তোয়ালে (toalha), তোলো(হাঁড়ি tolha), তিজেল (tigela), তামাক (tobaco), বেহালা (viola), বরগা (verga), বেসালি (vasilha), বিস্তি (vinte) ইত্যাদি।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

তদ্ভব শব্দকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ও কী কী? (৩০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

কৃতঋণ শব্দ কাকে বলে? (৩০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

বাংলা শব্দভাণ্ডারে বিদেশী শব্দ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৩.২.২.২.৬ ওলন্দাজ শব্দ

ওলন্দাজ ভাষা থেকে যে কয়েকটি শব্দ বাংলায় এসেছে তার প্রায় সবই হচ্ছে তাস খেলার বিষয়ে। যেমন - হরতন (haraten), রুইতন (ruiten), ইস্কাবন (schopen), তুরুপ (troef), ইসক্রুপ (schroef), ওলন্দাজ শব্দ।

৩.২.২.২.৭ ফরাসি শব্দ

ফরাসিরাও এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় কয়েকটি ফরাসি শব্দ বাংলায় এসেছে। যেমন - কার্তুজ (cartouche), কুপন (coupen), রেস্তোরাঁ (restaurant), আঁতাত (entete), রেনেসাঁস (renaissance), বুর্জোয়া (bourgeois) ইত্যাদি।

৩.২.২.২.৮ ইংরেজি শব্দ

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশ ইংরেজ শাসনের আওতায় আসে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের প্রভাব পড়তে শুরু করে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে সমস্ত ইংরেজি শব্দ বাংলায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তার অনেক গুলিই বাংলা তদ্ভব শব্দ হয়ে পড়েছে। যেমন- বাট (bord), কার (cord), অফিস (office), লন্টন (lantern), লম্প (lemp), গেলাস (glass), বাকস বা বাসক (box), গারদ (guard), পুলিশ (police), উট্-পেনসিল (wood pencil) সান্ত্রি (sentry) ইত্যাদি।

পরবর্তী কালে এবং আধুনিক সময়ে আরো অনেক ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে বা করছে। সেগুলির মধ্যে আছে চেয়ার, টেবিল, রিক্সা, ডেস্ক, বেঞ্চ, স্টেশন , সিনেমা, টিকিউ, শার্ট, কোট, কোর্ট, থিয়েটার, ফটো, বায়োস্কোপ, ট্রেন, ফোন, টেলিগ্রাফ, টোস্ট, টেপুটি, মাস্টার, কলেজ, স্কুল, হল, পেয়ার ইত্যাদি।

কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বাংলার সমাসযুক্ত পদে উপসর্গের মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন-

হাফ- হাফ-আখড়াই (গান), হাফ-হাতা জামা, হাফ-মোজা।,

ফুল- ফুলপঞ্জিকা, ফুলমোজা।

হেও- হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলবি, হেড-মিস্ত্রি ইত্যাদি।

৩.২.২.২.৯ অনুদিত ঋণ

কোনো কোনো বিদেশী শব্দ অনুবাদ হয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে। এগুলিকে ইংরেজিতে বলে। Translation Loan. যেমন-

বিশ্ববিদ্যালয় (University) , বাতিঘর (light house) , গলাবন্ধ (veekliee, cravat), হাতাঘড়ি (wrist watch), পাদ প্রদীপ (foot light), বিষয় বস্তু (subject matter) , মাতৃভূমি (moter land), (রবীন্দ্রনাথ, fountain pen), হাতে গড়া (hand -made), সংবাদপত্র (newspaper), পাঠ্যপুস্তক (text book), ঘরে করা (home-made) ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলায় ইংরেজি থেকে অনুদিত কিছু শব্দ ও ইডিয়ম প্রচলিত হয়েছে। যেমন- আনন্দের সঙ্গে (with pleaseure), দুঃখিত (sorry), বাধিত (indebted), অনুগৃহীত (obliged), স্বর্ণযুগ (golden age), স্বর্ণাক্ষর (golden letters), সুবর্ণ সুযোগ (golden opportumity) আমি আসতে পরি কি? (May I come in) ইত্যাদি।

৩.৩ পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ

বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে পরিভাষা বা পরিভাষিক শব্দের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় শব্দসংখ্যা ক্রমবর্ধমান গতিতে ভাষার ভাণ্ডারকে স্ফীত করে তুলছে। জাতি বিচারে এদের কিছুসংখ্যক মৌলিক, কিছু সংখ্যক আগন্তুক। আবার সূক্ষ্মতম বিচারে এই পরিভাষা সমূহের মধ্যে তৎসম, ইংরেজি প্রভৃতি শব্দ- যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক নবোদ্ভূত শব্দ। তাই বাংলা শব্দভাণ্ডারের আলোচনার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দের প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র পরিসরে উল্লেখ্য ও বিচার্য।

কোনো বস্তু, বিষয় বা ভাবের পরিচায়ক অনন্যার্থবোধক শব্দ বা প্রতিশব্দকে পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ বলা হয়। এই পারিভাষিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বা প্রয়োগগত অর্থ ভিন্ন প্রকার হলেও যখন কোনো পরিভাষা রূপে এর প্রয়োগ করা হয় তখন এর অপর কোনো অর্থ বোঝায় না, শুধু তার নির্দিষ্ট অর্থটিই বোঝায়। যেমন-'পদ' শব্দের নানাবিধ অর্থ এবং প্রয়োগ আছে, কিন্তু শব্দটি যখন ব্যাকরণে পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন শুধু 'বাক্যে ব্যবহারোপযোগী বিভক্তি যুক্ত শব্দ'- এই অর্থই বোঝায়।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের জগৎ এবং ভাবের জগতে উন্নতি সাধিত হচ্ছে এবং এর ফলে নিত্যনতুন বস্তু বিষয় ও ভাব আবিষ্কৃত হচ্ছে। এগুলির পরিচিতির জন্য যথোপযুক্ত সংজ্ঞা বা অধিকার প্রয়োজন। একই বস্তু যদি বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তবে, বস্তুটির পরিচিতি নিয়ে সমস্যা উদ্ভব হবে। তাই বস্তুটির সর্বজনমান্য একটি পরিচিতি প্রয়োজন। এভাবেই বিভিন্ন পরিভাষিক শব্দ বা পরিভাষা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

একালে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও অপরাপর নানা শাস্ত্রতথ্য বিষয়েই পরিভাষার প্রয়োজন চিরকাল অনুভূত হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতবর্ষেও যে ব্যাকরণ, জ্যোতিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজনে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছিল, সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, অপরাপর শাস্ত্র গ্রন্থ, চরক-সুশ্রুত আদি বৈদ্যক শাস্ত্র, পাণিনীয় ব্যাকরণ, কৌটিলের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

একালে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এবং সরকারি কাজে ব্যবহৃত পরিভাষা রূপে যে সমস্ত শব্দ গ্রহণ করা হচ্ছে, তাদের একাংশ যথাযথ রূপে কিংবা সামান্য ধ্বনিপরিবর্তন রূপে গৃহীত হয়। যেমন- ডিগ্রি (Degree) , মিনিট (Minute), অক্সিজেন (oxygen) ইত্যাদি। কতগুলি প্রতিশব্দ প্রচলিত ভাষা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- বস্তু (Mass), পরকলা (lens), হাওয়া (wind), টান (tention) ইত্যাদি। সাম্প্রতিক কালে সংবাদপত্রের প্রয়োজনেও কিছু পরিভাষা তৈরি হয়েছে। কাঁদানে গ্যাস (teargas),যানজট (trafficjam) ইত্যাদি। তবে পরিভাষা রূপে বেশি পরিচিত শব্দগুলি প্রায় সবই সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ। অবশ্য প্রচলিত শব্দযোগে তৈরি কিছু নবসৃষ্ট শব্দও রয়েছে। যেমন- দূরবীক্ষণ (telescope), স্বরসংগতি (vowel harmony) নিদানবিধ্যা (actiologhy). প্রয়োজন কিছু নতুন শব্দও তৈরি হয়েছে। যেমন- অপিনিহিত (apenthesis),অভিশ্রুতি (umlaut), অপশ্রুতি (ablout) ইত্যাদি। তবে একালে পরিভাষারূপে প্রযুক্ত বিরাট সংখ্যক শব্দই প্রচলিত অথবা প্রাচীনতর গ্রন্থে প্রাপ্ত। যেমন - অবর (under), বরিষ্ঠ (senior), আয়োগ (commission), যোজনা (planning) ইত্যাদি।

আত্ম-সমীক্ষমূলক প্রশ্ন

অনুদিত ঋণ বলতে কী বোঝায়? (২৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

পরিভাষা কী? (২৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

পরিভাষা সংকলনের প্রয়োজনীয়তা কী? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) বাংলা শব্দভাণ্ডারে বিদেশী শব্দের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রস্তুত করুন?

(সংকেত সূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

(খ) পারিভাষিক শব্দ বলতে কী বোঝায়? বাংলা শব্দভাণ্ডারে পারিভাষিক শব্দের অন্তর্ভুক্তি আলোচনা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

(সংকেত সূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

৩.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বাংলা শব্দভাণ্ডার বিষয়ক বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার শেষে এবারে আমাদের সামগ্রিক বক্তব্যের সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি যে ভাষার একমাত্র উপাদান তার শব্দভাণ্ডার। শব্দভাণ্ডারে সমৃদ্ধির মানদণ্ডেই একটি ভাষা বিশ্বের দরবারে আদরণীয় হয়। শব্দ শুধু ভাব প্রকাশের উপাদান নয়, ভাষার শব্দরাশির মধ্য দিয়ে তার প্রাণ প্রবাহের সন্ধান পাওয়া যায়। ধাতুতে অথবা শব্দে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ নির্মাণ এবং অন্যভাষা থেকে শব্দ গ্রহণের মাধ্যমে কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দসমূহ কোনো ভাষার প্রধান সম্পদ। প্রাকৃত মাধ্যমে বিবর্তিত তদ্ভব শব্দগুলিই বাংলা ভাষার প্রাণ, তবে বিভিন্ন সময় এতে বিভিন্ন ভাষার প্রচুর শব্দ প্রবেশ করেছে।

বাংলা শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত বিচারে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে -- মৌলিক এবং আগন্তুক শব্দ। মৌলিক শব্দসমূহের আবার তিন রকমের বিভাজন রয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনায় এই তিন রকম শ্রেণির উদাহরণের উল্লেখ করেছি। আগন্তুক শব্দকেও দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে -- দেশী ও বিদেশী শব্দ। আমরা বিদেশী শব্দের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

পারিভাষিক শব্দের আলোচনায় আমরা বাংলা শব্দভাণ্ডারে এই পারিভাষিক শব্দগুলির অন্তর্ভুক্তি ও গুরুত্ব নির্ণয় করেছি; আলোচনা করেছি পারিভাষিক শব্দের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে।

৩.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। তদ্ভব শব্দ কাকে বলে? বাংলা ভাষায় কত প্রকার তদ্ভব শব্দ আছে তাদের উৎস নির্দেশসহ তালিকা দিন। বাংলার নিজস্ব শব্দ কোনগুলি উল্লেখ করুন।

২। বাংলা তদ্ভব শব্দসমূহের উৎস ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করুন।

৩। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দগুলির ভাষাগত একটি তালিকা উপস্থিত করুন।

৪। বাংলা ভাষায় গৃহীত বিদেশী শব্দ, প্রত্যয় ও উপসর্গের একটি তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৩.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৪
শব্দার্থ ও শব্দার্থপরিবর্তন

বিষয় বিন্যাস

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ শব্দের অর্থপরিবর্তন

৪.৩ শব্দের অর্থপরিবর্তনের কারণ

- ৪.৩.১ মনস্তাত্ত্বিক কারণ
  - ৪.৩.১.১ সাদৃশ্য
  - ৪.৩.১.২ মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার
  - ৪.৩.১.৩ শৈথিল্য ও আরমপ্রিয়তা
  - ৪.৩.১.৪ সুভাষণ ও দুর্ভাষণ
- ৪.৩.২ আলংকারিক কারণ
- ৪.৩.৩ ভৌগোলিক ও পারিবেশিক কারণ
- ৪.৩.৪ শব্দার্থপরিবর্তনে ইতিহাসের ইঙ্গিত ও ঐতিহাসিক কারণ
- ৪.৩.৫ উপকরণগত কারণ

৪.৪ শব্দার্থপরিবর্তনের ধারা

- ৪.৪.১ শব্দার্থ পরিবর্তনের ত্রিধারা
  - ৪.৪.১.১ অর্থবিস্তার ও অর্থপ্রসার
  - ৪.৪.১.২ অর্থসংকোচ
  - ৪.৪.১.৩ অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ
- ৪.৪.২ অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ
- ৪.৪.৩ অর্থের অবনতি বা অর্থাপকর্ষ

৪.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৪.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৪.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

ভাষার দুটি দিক, — একটি তার বাইরের প্রকাশরূপ এবং অন্যটি তার ভিতরের ভাব বা অর্থ। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার এই অর্থসম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থতত্ত্ব বলে। ভাষার পরিবর্তন শুধু ধ্বনির এবং পদের পরিবর্তনই ঘটায় না, শব্দের অর্থপরিবর্তনও ঘটায়। সুতরাং শর্ব্দার্থপরিবর্তন ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার একটি অপরিহার্য অঙ্গিভূত নয় তবু ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় এটি একটি আবশ্যক অনুষঙ্গ।

অবশ্য অনেক ভাষাবিজ্ঞানী শুধুমাত্র ভাষার বাইরের গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শব্দার্থকে ভাষাবিজ্ঞানের বহির্ভূত বলে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু মানুষের মনের খেলাকে বিজ্ঞানের সূত্রের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, তাই শব্দার্থতত্ত্বকে ঠিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ডে শব্দার্থতত্ত্বকে তাঁরা তাই ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু সাম্প্রতিককালের আব্রাহাম নোয়াম্ চম্স্কি যে নতুন রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞান প্রবর্তন করেছেন, তাতে শব্দর্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদের সমর্থক ভাষাবিজ্ঞানিগণ শব্দের অর্থকে ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন এবং অর্থের সঙ্গে যোগ রেখেই ভাষার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন। বস্তুত শব্দার্থই ভাষার প্রাণ। তাই শব্দের ভাব বা অর্থকে বাদ দিলে ভাষার কোনো উপযোগিতা থাকে না। তাই শব্দার্থতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সুদূর প্রাচীনকাল, যে সময়ের কোনো চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না, সে কালেরও অল্পসল্প ইতিহাসের আভাস শব্দার্থতত্ত্বের সাহায্যেই পাওয়া যায়। সুদূর অতীত ইতিহাসের জীণোদ্ধারই শুধু নয় বর্তমানকালের প্রাত্যহিক ব্যবহারেও শব্দার্থতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রকট। সাহিত্য সভ্য মানুষের মনের খাদ্যভাণ্ডার। সাহিত্যের প্রধান কাজ বাক্শিল্প সৃষ্টি। বাক্শিল্পের প্রাণ অলংকার এবং এই অলংকার শব্দার্থেরই বিষয়।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বর্তমান বিভাগে আমাদের আলোচ্য বিষয় শব্দের অর্থপরিবর্তনের কারণ ও তার পরিবর্তনের দারাসমূহ। শব্দ বস্তু বা ভাবকে পরিস্ফুট করে। কোনো শ্বদকে বিশ্লেষণ করলে তার মূল অর্থটি পাওয়া যায়। মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের পরিসীমাও বাড়তে থাকে, এবং এই পরিসীমা বৃদ্ধির ফলে একই শব্দ বা শব্দমূল একাধিক বস্তু বা ভাবকে নির্দেশ করে। এরই প্রত্যক্ষ ফল শব্দার্থের পরিবর্তন। এই অধ্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে আপনারা—

- শব্দার্থতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- শব্দের অর্থপরিবর্তনের কারণসমূহ অনুধাবন করতে পারবেন।
- শব্দার্থপরিবর্তনের কারণসমূহ অনুধাবন করতে পারবেন।

- শব্দার্থপরিবর্তনের প্রধান তিনটি ধারা (ত্রিধারা) এবং সেইসঙ্গে অর্থপরিবর্তনের অন্য দুটি অপ্রধান ধারা সম্পর্কেও সম্যকধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৪.২ শব্দের অর্থপরিবর্তন

শব্দার্থতত্ত্ব বা শব্দের অর্থপরিবর্তন ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দের অর্থপরিবর্তন-কাহিনি বড়ো বিচিত্র এবং মনোরম। এতে মানব মনের বিচিত্র চিন্তা ধারার পরিচয় প্রকাশিত হয়। এই অর্থপরিবর্তনের পেছনে সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ এবং মানবভাবনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানবমনের বিভিন্ন ভাবনা অনুযায়ী একই শব্দ বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো অন্য শব্দের সঙ্গে মিলে 'ইডিয়ম' তৈরি হয়ে মূল শব্দের অর্থ অনেকখানি বদলে যায়। একই শব্দ বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে যে সমস্ত অর্থ জ্ঞাপন করে ভাষাব্যবহারকারীর মনে সেই শব্দের সঙ্গে সেই সমস্ত অর্থসমষ্টির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাম তার গুরুকে মাথায় করে রেখেছে; অঙ্কে তার মাথাই নেই; মেয়েটির মাথায় একরাশি চুল; হরিবাবু গ্রামের মাথা; পথের শেষ মাথায় তার ঘর; ঝোঁকের মাথায় কাজ করতে নেই — ইত্যাদি প্রতিটি বাক্যে 'মাথা' শব্দটি বিভিন্নার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই বাক্যগুলি থেকে 'মাথা' শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা পাওয়া যায় সেই অর্থসমষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি অর্থ মুখ্য, বাকি সব গৌণ অর্থ। বস্তুত মুখ্য অর্থটি থেকেই সমস্ত গৌণ অর্থের উৎপত্তি। কিন্তু কালক্রমে হয়তো গৌণ অর্থসমূহ এমন প্রাধান্য লাভ করতে পারে যে শেষে মুখ্য অর্থের সঙ্গে গৌণ অর্থগুলির কোনো সম্বন্ধ নাও পাওয়া যেতে পারে। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলিতে 'মাথা' শব্দের বিভিন্ন গৌণ অর্থ হচ্ছে সম্মান, প্রবণতা, মাথার খুলির উপরিভাগ, প্রধান, প্রান্তে, ভর ইত্যাদি। এই সবগুলি অর্থই এসেছে মুখ্য অর্থ 'শরীরের উর্ধ্বতম অঙ্গ (= মস্তক)' থেকে।

একাধিক অর্থ নেই এমন শব্দের সংখ্যা বস্তুত খুবই কম। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষা বাদ দিলে সকল শব্দই লোকব্যবহারে প্রসঙ্গ অনুযায়ী একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন ভাত শব্দটির মৌলিক অর্থ একটি, কিন্তু 'হাতে মারে না ভাতে মারে', 'ডালভাতের ব্যবস্থা' — এই দুটি বাক্যে 'ভাত' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে শুধু সেদ্ধ করা চাল নয়, সমস্ত সংসার সামগ্রী বোঝাচ্ছে।

যখন কোনো শব্দের মুখ্য অর্থ লুপ্ত হয়ে গৌণ অর্থগুলি প্রাধান্য লাভ করে তখন বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের প্রসঙ্গে পদের প্রকৃত অর্থ অনেক সময় ধরা পড়ে না। বক্তার, শ্রোতার অথবা ক্রিয়ার, বার্তার প্রসঙ্গ থেকে তা অনুধাবন করতে হয়। অর্থাৎ একটি শব্দের বিশিষ্ট অর্থটি তার প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল।

উপযুক্ত কথাগুলো মনে রেখে এবার শব্দের অর্থপরিবর্তনের কারণসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

শব্দার্থতত্ত্ব কী? ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনার গুরুত্ব কতটুকু? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

শব্দে অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানবমনের ভূমিকা কীরূপ? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৪.৩ শব্দার্থপরিবর্তনের কারণ

ভাষা নদীর মতো প্রবহমান, অর্থাৎ তা গতিশীল। তাই কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি তার ভেতরের অর্থেরও পরিবর্তন হয়। ভাষার নিজস্ব গতির টানে শব্দের মূল অর্থ ক্রমেই দূরতর হয়, ফলে একসময় শব্দার্থের পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নানা কারণেই শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে। সেই সমস্ত কারণগুলিকে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক-গবেষকগণ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন পণ্ডিতদের এই শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে। আবার কোনো কোনো শব্দের অর্থ বিশ্লেষণে যুগপৎ একাধিক কারণের সন্নিবেশও লক্ষ করা যায়। আমরা এবার শব্দার্থপরিবর্তনের মূল কারণসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারি।

৪.৩.১ মনস্তাত্ত্বিক কারণ

শব্দার্থপরিবর্তনে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা অসাধারণ। শব্দার্থপরিবর্তনের অন্য কারণসমূহের মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিক অর্থান্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত মনস্তাত্ত্বিক কারণ শব্দার্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছে যে একে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

লক্ষনীয় প্রসঙ্গ

শব্দ প্রয়োগে অসতর্কতা এবং অজ্ঞতাও শব্দার্থ-পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। জোরে বলা বা ঘোষণা করা অর্থে যেমন 'সোচ্চার' শব্দটি খুব ব্যবহৃত হচ্ছে অথচ শব্দটির মূল অর্থ আদৌ এর সঙ্গে যুক্ত নয়, এর একটা অর্থ 'শব্দসহ বমি'। 'পাষণ্ড'

শব্দের অর্থ ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়বিশেষ, এখন 'নিষ্ঠুর'। ষণ্ড ও অমর্ক ছিলেন প্রহ্লাদের গুরু, কিন্তু কৃষ্ণদ্বেষী, তা থেকে'ষণ্ডামার্কা' সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে চলে এলো। 'অবদান' শব্দের অর্থ 'মহৎ কীর্তি', কিন্তু 'দান' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

বিবক্ষা অর্থাৎ বক্তার ইচ্ছানুযায়ী এবং কবিদের দ্বারা বিশেষ অর্থে ব্যবহারের জন্যও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘট্‌তে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'আকাশ' অর্থে 'ক্রন্দসী' শব্দের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু 'ক্রন্দসী' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'চীৎকারকারী সৈন্য'; মধুসূদন জেনেশুনেই বরুণ-পত্নী অর্থে 'বারুণী' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যদিও হওয়া উচিত ছিল 'বরুণানী'। বারুণী শব্দের অর্থ 'মদ্য'।

অতিশয়িত ব্যবহারেও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে। কাউকে একটু সম্মান দেখাতে গিয়ে অনেক সময়ই বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, ফলে মূল অর্থের মূল্য কমে যায়। বাস-ট্রামের কন্ডাক্টরদের মুখে 'বড়দা' আর 'দাদু' শব্দগুলোর অতিব্যবহারে এগুলোর মূল্য নষ্ট হয়ে গেছে। 'বাবু' শব্দেরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে।

মানসিক সহযোগের ফলে শব্দসংক্ষেপ বা অঙ্গচ্ছেদ দ্বারাও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। ক্ষৌরকর্ম >কামানো, প্রণাম>দণ্ডবৎ, ভোটান দেশ>ভুটান, খাইবার বস্তু>খাবার, বাইসাইকেল>বাইক, হিপোপটেমাস>হিপো, হেলিকপ্টার>কপ, ক্যালিবার>ক্যালি, ফণ্ডামেন্টাল>ফণ্ডা, খবরের কাগজ>কাগজ, Newspaper> Paper।

(ভাষাবিদ্যা পরিচয়: পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য)

৪.৩.১.১ সাদৃশ্য

ধ্বনিপরিবর্তনের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সাদৃশ্যে ভূমিকা এক্ষেত্রে ব্যাপক। শব্দার্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যের ভূমিকা ব্যাপক। শব্দার্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেহের মধ্যে মস্তকই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চে অবস্থিত, তাই তার সাদৃশ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অথবা উচ্চতা বোঝাতে যথেচ্ছভাবে 'মাথা' শব্দের ব্যবহার করা হয়, যেমন গাঁয়ের মাথা, গাছের মাথা, দইয়ের মাথা, মাথা ধরা, মাথায় রাখা ইত্যাদি। 'বড়ো' বোঝাতে 'রাম', 'রাজ' 'হাতি', 'ঘোড়া' ইত্যাদি শব্দের ববহারও প্রচলিত, যেমন — রামধনু, রামপাঁঠা, রামবোকা, রাজপথ, ঘোড়ানিম, 'হাতিপাড়' (শাড়ি) ইত্যাদি।

অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দুদিক থেকে হতে পারে — একটি শব্দের ধ্বনির সঙ্গে অন্যশব্দের ধ্বনির সাদৃশ্য এবং একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সাদৃশ্য। 'রোদসী' শব্দের সঙ্গে 'ক্রন্দসী' শব্দের আংশিক ধ্বনিগত সাদৃশ্যের ফলে 'ক্রন্দসী' শব্দটির অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বৈদিক ভাষায় 'ক্রন্দসী' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদ্বয়'; এবং'রোদস' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'দুই জগৎ' (স্বর্গ ও পৃথিবী), — তা থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'অন্তরীক্ষ'। 'রোদসী' শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্যের ফলে রবীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী' শব্দটি ও 'অন্তরীক্ষ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। একটি

জিনিসের সঙ্গে অন্য একটি জিনিসের আকৃতি বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অনেক সময় একটি জিনিসের নাম অন্য জিনিসটি বোঝাবার জন্য প্রযুক্ত হয়। যেমন তিল-তেল যে শস্য থেকে তৈরি হয় তার কালো রঙের সঙ্গে মানুষের শরীরের ছোটো গোল কালো রঙের দাগের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, তাই সেই দাগকেও 'তিল' বলা হয়। তিল শব্দে আগে শুধু বিশেষ শস্যকেই বোঝাও, এখন শরীরের বিশেষ কালো দাগকেও বোঝায়।

৪.৩.১.২ মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার

মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে সংস্কার শব্দার্থপরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কটূতা বা ভয়ংকরতা এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত মৃদু বা নিরীহ শব্দ ব্যবহার দ্বারা শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘকে বলে 'বড়োশেয়াল', রাত্রি বেলা অনেকে সাপকে বলে 'লতা' বসন্ত রোগকে বলা হয় 'মায়ের দয়া' বা 'শীতলার দয়া'।

অন্ধবিশ্বাসও শব্দার্থপরিবর্তনের অন্যতম কারণ। যারা গুরুজনের নাম গ্রহণ করতে পারে না, অথচ প্রয়োজনে উল্লেখ করতে হয় তারা কালীচরণকে ময়লাচরণ (গুরুজনের নাম কালী), তুলসীপাতার রস বোঝাতে গিয়ে সম্পর্কের উল্লেখ করেন (ভাসুর ঠাকুরের বৈষ্ণব পাতার রস) অর্থাৎ ভাসুরের নাম তুলসী)। গোঁড়া বৈষ্ণবরা শাক্ত দেবদেবী সংক্রান্ত কোনো কিছুর নাম উল্লেখ করেন না, অথচ প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে গিয়ে তাঁরা যে পন্থা অবলম্বন করেন জনৈক বৈষ্ণবের বিবরণে তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় — 'হাতিশুঁড়ার মায়ের মাঠে. তিন ভিরিঙ্গার ডালে, প্রভুরে বানাইয়া রাখছে, রস পড়ে তার নালে।' অর্থাৎ দুর্গাপুরের মাঠে একটা বেলগাছের ডালে একটা পাঁঠা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তার থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে।

৪.৩.১.৩ শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা

ভাষাবাবহারে শৈথিল্যের ফলে অনেকসময় অর্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে। শৈথিল্যের বলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা একটি শব্দগুচ্ছের সম্পূর্ণ ব্যবহার না করে তার অংশ বিশেষ দিয়ে কাজ চালাই। এতে শব্দটির নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। যেমন— 'সন্ধার সময় প্রদীপ দেওয়া' এই অর্থে 'সন্ধ্যা দেওয়া', 'একটু চা-টা খেতে যাও' — এখানে 'টা' মানে 'জলখাবার'।

বাক্যাংশকে সংক্ষেপ করার জন্য কখনো শব্দের অর্থ বদলে যায়। যেমন 'খাইবার জিনিস' অর্থে 'খাবার' শব্দের উদ্ভব। সোজা লাঠির মতো হয়ে প্রণাম করাকে দণ্ডবৎ প্রণাম বাংলায় শুধু 'দণ্ডবৎ' বলা হয়। বাংলা 'ভূটান' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'ভোটানাং দেশ' থেকে। ব্যক্তিনামের বহুবচনে 'রামেরা এসেছে' বলতে 'রামেরা' শব্দে রাম এবং তার পরিজনকে একসঙ্গে বোঝায়।

৪.৩.১.৪ সুভাষণ ও দুর্ভাষণ

সাধারণ লোকের ধারণা যে অশুভবিষয় বা বিপদজনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এই সংস্কারের বশে অনেক সময় অশুভ বিষয়কে বা বিপজ্জনক বস্তুকে শুভ বা শোভন নাম দেওয়া হয়। একে শুভাষণ বলে। এতে নতুন নামটির নতুন অর্থে প্রয়োগ হতে হতে তার অর্থ পরিবর্তন ঘটে। অকল্যাণসূচক বা নিন্দিত ও কুৎসিত শব্দকে ভদ্রভাবে প্রকাশ করার জন প্রায় সব ভাষাতেই সুভাষণ রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। যেমন— মৃত্যু অর্থে বাংলায় 'পরলোক প্রাপ্তি' 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি', 'স্বর্গলাভ' ইত্যাদি বলা হয়। বিদায় একটি অবাঞ্ছনীয় ঘটনা। তাইবিদায় জ্ঞাপক 'যাই' অর্থে 'আসি' বলা হয়। অন্ন এবং গৃহস্থের পক্ষে অকল্যাণসূচক। তাই 'চাল নেই' বোঝাতে 'চাল ঝড়ন্ত' বলা হয়।

কারো হয়তো কেবল কন্যাসন্তানই জন্মাচ্ছে বাবা মা আর কন্যা চান না, ভগবানের কাছে সেটাই প্রার্থনা করেন। অতএব মেয়ের নাম রাখা হয় 'আন্নাকালী' (অর্থাৎ আর না কালী)।

হীন কাজকে শোভনতা দানের উদ্দেশ্যেও অনেক মহৎ শব্দকে শোভনতা দানের উদ্দেশ্যেও অনেক মহৎ শব্দকে হীন অর্থে ব্যবহার দ্বারা অর্থপরিবর্তন সাধিত হয়। রান্নার কাজ করে যে পুরুষ তাকে 'ঠাকুর/মহারাজ' বলে আখ্যাদিতকরা হয়। বাড়ির কাজের দাসীকে কন্যার মর্যাদায় অভিসিক্ত করে বলা ব্যবহারের ফলে শব্দের অর্থ কৌশিল্য নষ্ট হয়ে যায়। এটি সেরকমই একটি উদাহরণ। এমন 'ঝি'কে বলা হয় কাজের 'লোক'। নিম্নশ্রেণির লোককে 'হরিজন' বলার রীতি সমাজে চালু আছে, ঠিক সে রকম ক্ষৌরকর্ম সম্পাদনকারীকে বলা হয় 'নরসুন্দর', চোরকে বলা হয় 'নিশিকুটুম'। বাংলায় নাগর শব্দের মূল অর্থ নগরের লোক অর্থাৎ বিদগ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু এখন প্রচলিত অর্থ 'অবৈধপ্রণয়ী'। সংস্কৃত প্রীতি থেকে উৎপন্ন পিরিত শব্দটি বাংলায় হীনার্থে প্রযোজ্য। ব্যক্তিবাচক 'রাম' শব্দটি বাংলায় যখন বিশেষণ হিসাবে 'বড়ো' অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন এটি হীনার্থ। যেমন রামবোঝা, রামখোকা।

সুভাষণের বিপরীত রীতি অর্থাৎ ভালোকে মন্দরূপে প্রকাশ করা হলে তাকে চলে দুর্ভাষণ। আদর জানাতে কিংবা অপদেবতার দৃষ্টি এড়াতে কিংবা বিনয় প্রকাশের ক্ষেত্রে দুর্ভাষণের ব্যবহৃত হয়। যেমন — পুত্র অর্থে 'বেটা' (বেটা শব্দের আসল অর্থ বিনা বেতনের মজুর)। ঠিক সেরকম কাউকে আদর করে 'শালা' বলাও দুর্ভাষণেরই প্রকাশক।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

শব্দার্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের ভূমিকা কী? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

সুভাষণ ও দুর্ভাষণ বলতে কী বোঝায়? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৪.৩.২ আলংকারিক কারণ

অলংকারিক অর্থে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকলে অনেক সময় শব্দটি শেষ পর্যন্ত তার আলংকারিক তাৎপর্য হারিয়ে সাধারণ গতানুগতিক অর্থেই প্রচলিত হয়ে যায়, বা তার অর্থের কিঞ্চিত পরিবর্তনঘটে। যেমন সন্ধ্যায় ফোটে বলে একটি ফুলকে সন্ধ্যার মণি স্বরূপ কল্পনা করে প্রথমে তাকে আলংকারিক অর্থে 'সন্ধ্যামণি' বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন বহু ব্যবহারে এটি ফুলটির সাধারণ নামে পরিবর্তিত হয়েছে। ঠিক সেরকম ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়া অর্থে গণেশ ওলটানো, মিথ্যা কথা বলা অর্থে গুল মারা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অলংকার প্রয়োগের জন্য শব্দের অর্থ বদলে যায়। এভাবেই গরু বলতে মুর্খ বোঝায়। পৃথিবীর সব ভাষাতেই অলংকার আরোপের ফলে শব্দার্থ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাচীন কালের রূপক অলংকার প্রয়োগর ফলে অনেক শব্দের মৌলিক অর্থ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। এই সকল শব্দ যে অলংকারের প্রয়োগ থেকে সৃষ্ট তা সহজে ধরা যায় না। যেমন — 'দারুণ' মৌলিক অর্থে দারুনির্মিত, তা থেকে 'দারু নির্মিত দ্রব্যের মতো কঠিন', অবশেষে 'অত্যন্ত কঠিন' > অত্যন্ত হয়েছে। 'মধুর' শব্দের মৌলিক অর্থ ছিল 'মধুযুক্ত'। তা থেকে যথাক্রমে 'মধুবৎ সুস্বাদু', ' রমণীয়', 'চমৎকার' ইত্যাদি অর্থের উদ্ভব। 'গবাক্ষ' শব্দের মূল অর্থ 'গোরুর চোখ'। প্রাচীন কালে গোরুর চোখের মতো ঘুলঘুলি জানালা থাকত, তা থেকে 'জানালা' অর্থে 'গবাক্ষ' শব্দের উদ্ভব। 'গোষ্ঠী' শব্দের মূল অর্থ 'যেখানে অনেক গরু থাকে' > 'সমূহ'। 'সগোত্র' মানে 'এক গোয়ালের গরু', রূপকার্থে একধর্মী মানুষকে বোঝাতে 'সগোত্র' শব্দের প্রয়োগ হয়। পূর্বে 'বীণা বাদনে দক্ষ ব্যক্তি'ই ছিলেন 'প্রবীণ'। আধুনিক বাংলায় 'প্রবীণ' শব্দটি 'বয়সে বৃদ্ধ' অর্থে প্রযুক্ত। 'হরতাল' শব্দটি গুজরাটি 'হড়তাল' — মূল অর্থ 'হাটে তালা', কিন্তু বর্তমানে 'ধর্মঘট' অর্থে প্রযুক্ত।

ব্যষ্টির স্থলে সমষ্টির অলংকার এবং সমষ্টির স্থলে ব্যষ্টির অলংকার প্রয়োগেও অর্থপরিবর্তন ঘটে। লাল রঙের পানীয় মাত্রেই আর 'লাল পানি' নয়, এখন একটি বিশেষ পানীয়ের ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সবুজ রঙবিশিষ্ট হলেই তাকে আর সবজি বলা হয় না, কারণ সবজি মাত্রই সবুজ নয়। 'ভাত-কাপড়' দেওয়া অর্থে শুধু ভাত আর কাপড় দেওয়াকেই নয়, যাবতীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থাকেই বোঝায়। অতিশয়োক্তি অলংকারও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন — ভয়ংকর ছেলে, ভীষণসুন্দর, সাপের পাঁচ পা দেখা, বাড়ি মাথায় করা ইত্যাদি।

অতি নম্রতা প্রদর্শনের জন্যও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন নিজের বাড়ি হলে বলা হয় 'গরিবখানা' অন্যের হলে 'দৌলতখানা'।

৪.৩.৩ ভৌগোলিক ও পারিবেশিক কারণ

একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন — 'অভিমান' শব্দটি বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল প্রকৃতিতে অনেকটাই কোমল অনুভূতির প্রকাশক — 'স্নেহমিশ্রিত অনুযোগ'। কিন্তু পশ্চিম ভারতের শুষ্ক কঠিন কঠোর প্রকৃতিতে অভিমান শব্দের অর্থে সেই কোমলতা নেই, হিন্দিতে 'শাক' শব্দের অর্থ 'রান্না করা তরকারি' কিন্তু বাংলায় — 'রান্না না করা পাতা'। স্থান-কাল রীতিনীতি প্রভৃতি বদলালেই শব্দের অর্থ বদলে যায়। ফরাসি 'মুর্গ' 'যে কোনো পাখি' কিন্তু বাংলায় তা 'কুক্কুট' অর্থাৎ 'এক বিশেষ ধরনের পাখি'। ইংরেজি Glass হচ্ছে 'কাচের তৈরি জলপাত্র কিন্তু বাংলায় 'গ্লাস' বলতে যে কোনো জলপাত্রকে বোঝায়।

৪.৩.৪ শব্দার্থপরিবর্তনে ইতিহাসের ইঙ্গিত ও ঐতিহাসিক কারণ

শব্দার্থপরিবর্তনের মধ্যে ইতিহাসের আভাস-ইঙ্গিত লুকোনো থাকে। কোনো শব্দের প্রাচীন অর্থ জানতে পারলে সেই সময়ের প্রাচীন রীতিনীতি সম্পর্কেও জানা যায়। যেমন — সংস্কৃতে 'পশু' শব্দের মূল অর্থ গরু, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী। ইংরেজিতে এই শব্দের সগোত্র হচ্ছে 'ফি' (Fee) যার আধুনিক অর্থ 'বুদ্ধিজীবীর পারিশ্রমিক'। এই অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে এককালে পশুর বিনিময়েই ক্রয়বিক্রয় চলত, তাই 'গৃহপালিত প্রাণী'র অর্থ দাঁড়াল 'বিনিময় মূল্য', তা থেকে 'মূল্য', 'অর্থ' এবং অবশেষে 'বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির পরিশ্রমের নির্দিষ্ট মূল্য'।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের প্রধান অর্থের সঙ্গে জড়িত অবান্তর অর্থগুলি বাতিল হয়ে এগুলির মধ্যে কোনো একটি অতিরিক্ত অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। যেমন 'বর' শব্দের প্রাচীন অর্থ 'কন্যা নির্বাচনকারী', এ থেকে 'কন্যা' 'নির্বাচনকারী বিবাহার্তি', তা থেকে শুধু 'বিবাহার্তি' এবং সব শেষে 'স্বামী' বা 'পতি' অর্থ হয়েছে।

জীবন যাত্রার পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যদের জীবনধারা কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠেনি। এরা অরণ্যের পশু-পক্ষী ফল-মূল খেয়ে জীবনধারণ করত এবং বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াত। তাই আর্য নামের মূল অর্থ 'গতিশীলতা' > গতিশীল গোষ্ঠী'। কৃষিনির্ভর স্থিতিশীল হওয়ার পরেও তাদের আর্য নামটি থেকে যায়। তখন 'গতিশীল গোষ্ঠী' অর্থপরিবর্তনের ফলে দাঁড়ায় 'ইন্দো-ইউলোপীয় বংশের নৃজাতি'।

আদিম যুগে পুরুষরা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে

নিয়ে যেত। তাই বিবাহ শব্দটি বিশেষ রূপে বহন করার অর্থেই প্রথমে প্রচলিত ছিল। ক্রমে সমাজে এই আদিম বর্বর বিবাহবিধি অপ্রচলিত হয়ে যায়। এখন বিবাহ মানে 'পরিণয়-সূত্র'।

শ্বশুর শাশুড়ি ইত্যাদি শব্দের অর্থ আগে ছিল পতির পিতা-মাতা, এখন এই শব্দগুলি পত্নীর পিতামাতাকেও বোঝায়। 'তুরুষ্ক' 'তুলষ্ক' শব্দটি এসেছে 'তুর্ক' > প্রাকৃত 'তুরক্ক' তুলক্ক' শব্দ থেকে। এদেশে মুসলমান আগমনের প্রথম যুগে তুর্কি সৈনিক বিভীষিকার পাত্র ছিল। তাতে শব্দটির অর্থ হয়েছল লুণ্ঠনকারী বিদেশী সৈন্য, মধ্য বাংলায় 'মুসলমান'। কিন্তু বর্তমানে 'তুরুক' বা 'তুরুক সওয়ার' বলতে বোঝায় 'অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈনিক'।

পাত্র বা বস্তুর পরিবর্তনেও শব্দের অর্থান্তর ঘটে। Penna বা পালকের সাহায্যে লেখনী তৈরি হত বলে তার নাম ছিল 'Pen' কিন্তু এখন স্টিল-নির্মিত কলমকেও 'Pen' বলা হয়। জল বা বালি বোঝাই ঘড়ার সাহায্যে সময় নিরূপণ করা হত বলে তাকে বলা হত ঘড়ি, কিন্তু অধুনা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সময় জ্ঞাপন করা হলেও 'ঘড়ি' নামটি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ঠিক সেরকম তুলি প্রস্তুত হত তুলো দিয়ে, কিন্তু এখন পশুলেজ বা নাইলনের দ্বারা তৈরি হলেও নামটি পরিবর্তিত হয়নি।

প্রথা সম্বন্ধীয় বাতাবরণের ফলেও অর্থান্তর ঘটে। যজ্ঞকর্তার সামনে উপস্থাপিত হত বলে 'অগ্নি'র নাম ছিল পুরোহিত (সম্মুখে স্থিত)। অগ্নি এখন আর পুরোহিত নন, যিনি যজ্ঞকর্তার হয়ে কাজ করেন, তিনিই হলেন পুরোহিত।

৪.৩.৫ উপকারণগত কারণ

যে উপকরণে কোনো বস্তু তৈরি হয় সেই উপকরণের নাম বা ধর্মানুসারেও অনেক সময় বস্তুটির নামকরণ হতে পারে। কিন্তু পরে সেই উপকরণটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও পুরোনো নামটিই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে পুরোনো নামটির সঙ্গে উপকরণটির আর কোনো যোগ থাকে না, পুরোনো নাম দ্বারা নতুন জিনিস কে বোঝায়। নামটির অর্থ সেখানে এমন পরিবর্তিত হয়ে যায় যে তাতে নতুন উপকরণে গঠিত বস্তুকে বোঝানো হয়। যেমন — পূর্বে 'কালি' (ink) বলতে 'কালো'(black) উপকরণে গঠিত কালো তরল পদার্থকেই বোঝাত। পরবর্তীকালে 'কালি' বলতে শুধু কালো তরল পদার্থ নয়, 'লাল' 'সবুজ' প্রভৃতি রঙে গঠিত লেখার উপকরণকেও বোঝায়। 'প্যাপিরাস' (Papyrus) গাছের মজ্জা দিয়ে কাগজ তৈরি হত বলে ইংরেজিতে কাগজকে বলা হত 'পেপার' (Paper)। এখন 'পেপার' বলতে প্যাপিরাস গাছ ছাড়া বাঁশের মণ্ডে তৈরি কাগজকেও বোঝায়।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

অলংকার প্রয়োগের ফলে শব্দের অর্থ কীভাবে পরিবর্তিত হয়? (৭০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

একই শব্দ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন অর্থে কীভাবে ব্যবহৃত হয় উদাহরণ দিয়ে বোঝান। (৩০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

'বিবাহ' শব্দটি কী কী কালোচিত অর্থ পরিবর্তনের ফলে বর্তমানরূপ প্রাপ্ত হয়েছে? (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) শব্দার্থপরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

(সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

৪.৪ শব্দার্থপরিবর্তনের ধারা

শব্দের অর্থ দুরকম হতে পারে — মুখ্যার্থ এবং গৌণার্থ। লক্ষণীয় মুখ্যার্থ এবং ব্যঞ্জনা শক্তির সাহায্যে শব্দের অর্থান্তর ঘটানো হয়ে থাকে। কোনো শব্দ ভাষায় বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হলে একদিকে যেমন অর্থে জীর্ণতা দেখা দেয়, অন্যদিকে মানসিক কারণ বা বহির্প্রভাবের ফলে অর্থে অন্যাবশ্যক বস্তুর সঞ্চয় জমে তাকে পৃথুলতা দান করে, আর তখনই অর্থ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। শব্দের অর্থপরিবর্তন নানা ধারাতেই প্রবাহিত হয়।

৪.৪.১ শব্দার্থ পরিবর্তনের ত্রিধরা

সাধারণত অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার, অর্থসংকোচ এবং অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রম — শব্দের এই প্রধান তিনরকম পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকগণ তাঁদের আলোচনায় এই তিন ধরনের পরিবর্তনকে একত্রে শব্দার্থপরিবর্তনের ত্রিধারা

বলে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অবশ্য এগুলি ছাড়াও শব্দের অর্থপরিবর্তনে আরো কিছু গৌণ প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা হয়েছে।

বস্তুত শব্দের অর্থপরিবর্তনের বহুমুখী প্রবণতার প্রায় সকল দিকই এই ত্রিধারার অন্তর্গত। এই তিনটি ধারার মাধ্যমেই অর্থপরিবর্তনের সকল দিক ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই অর্থপরিবর্তনের পেছনে সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ এবং মানবভাবনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এবারে আসুন এই তিনটি ধারাকে এক এক করে বিশ্লেষণ করা যাক।

৪.৪.১.১ অর্থবিস্তার ও অর্থপ্রসার

শব্দের অর্থ কখনো কখনো রূপকের অথবা অতিশয়োক্তির আবরণে দীর্ঘকাল থাকার পর মূল বস্তুনিরপেক্ষ হয়ে পড়ে এবং তার প্রসার বেড়ে যায়। একেই অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার বলা হয়। ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের গুণ ও ধর্ম তখন বস্তুটির গণ্ডি ছাড়িয়ে বহু বস্তুর সাধারণ গুণ ও ধর্মকে প্রকাশ করে। সংকীর্ণ শব্দ তখন ব্যাপক ভাব বা অধিকতর বস্তুকে বোঝায়।

শব্দের অর্থবিস্তারের আলোচনায় দেখা যায়, যে ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের ধর্ম ও গুণ অর্থবিস্তারের ফলে বিশেষ বস্তুর গণ্ডি ছাড়িয়ে বহু বস্তুর সাধারণ ধর্ম ও গুণ প্রকাশ করে থাকে। 'গৌরচন্দ্র' অবলম্বনে গীতই ছিল গৌরচন্দ্রিকা বা ভনিতাই গৌরচন্দ্রিকা। কালো রঙে লিখবার তরল উপাদান ছিল 'কালি' — এখন রঙ- এর প্রসার ঘটায় লাল কালি, সবুজ কালি ইত্যাদি। আবার 'কালির বড়ি' কিংবা 'জুতোর কালি' তরলও হয় না। কাজেই মূল অর্থের রং এবং তরলতা এখন আর কোনোটিই অবশিষ্ট নেই। পত্র- গাছের পাতা; এখন চিঠি অর্থেও ব্যবহার হয়, কারণ আগে চিঠি গাছের পাতায় লেখা হত। 'ফলাহার' বলতে ফলের আহার আর বোঝায় না — দই চিড়ে কলা দিয়ে ফলাহার > ফলার এর ব্যবস্থা হয়। 'পাত্র' — কোনো বস্তু স্থাপনের আধার যেমন, 'জলপাত্র', অর্থপ্রসারে কন্যাদানের আধার রূপে জামাতাই পাত্র হল। 'গবাক্ষ' শব্দের মূল অর্থ 'গোরুর চোখ', তৎসাদৃশ্যে ঘুলঘুলি জাতীয় বাতায়ন, এখন যে কোনো আকৃতির বাতায়ন। 'শ্বশুর' শব্দটি অর্থ স্বামীর পিতা, এখন কন্যার পিতাও শ্বশুর পদবাচ্য। বৈদিক 'বৃত্র' অসুরের নাম, কিন্তু কখনো কখনো সাধারণ শত্রুবাচক শব্দরূপেও ব্যবহৃত হত। যেমন — তর প্রত্যয় যোগে বৃত্রতর (অধিক বলবান শত্রু) এটি প্রাচীন কালে প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য কারণে আত্মোৎসর্গ করতে হলে অনেকে 'জতুগৃহে' প্রবেশ করতেন। সংস্কৃত 'জতুগৃহ' প্রাকৃত 'জৌহর' এবং বাংলায় 'জহর' রূপ ধরেছে, আর অর্থ 'জতুগৃহে পুড়ে মরা' থেকে 'পুড়ে মরা' এবং তা থেকে 'আত্মসম্মান রক্ষার্থে যে কোনো উপায়ে আত্মাহত্যা' — অর্থ দাঁড়িয়েছিল। 'পরশ্বঃ' সংস্কৃতে 'আগামী কালের পরদিন' কিন্তু বাংলায় আগামী কাল এবং গতকাল দুয়েরই পরদিন বোঝায়। 'গুণ' শব্দের অর্থ গোসম্বন্ধীয়, তা থেকে হল 'গরুর নাড়ী ভুঁড়ির তাঁত', তারপর অর্থবিস্তারে হল 'দড়ি' যেমন — গুণটানা, গুণছুঁচ),

'ধন্য' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ধনশালী', অর্থসম্প্রসারণে 'সর্বসৌভাগ্যবান'।

অর্থবিস্তারের ফলে অনেক সময় অর্থ প্রতীক স্থানীয় হয়ে পড়ে। যেমন, ভাত = সিদ্ধচাউল > জীবিকাসংস্থান; কড়ি = কপর্দক > ধনসম্পত্তি; বদন = যে অঙ্গ বাক্য বলে > মুখ (আদর অর্থে)

অর্থ বিস্তারের ফলে ব্যক্তিনাম সাধারণ বিশেষ্য এবং সাধারণ বিশেষ্য গুণবাচক বিশেষ্যে পরিণত হতে পারে। সংস্কৃত 'গঙ্গা' থেকে 'গাং' শব্দটি এসেছে। কিন্তু 'গাং' শব্দের অর্থ গঙ্গা নদী নয়, যে কোনো নদী, অধুনা যে কোনো নদীর শুকনো খাত। 'লক্ষ্মী' এখন শান্তশিষ্ট অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ নির্বিশেষে সাধারণ বিশেষণে পরিণত। 'হিন্দু' এসেছে সিন্ধু নদী থেকে। ব্যক্তিনাম 'সুরদাস' এখন কথ্য হিন্দিতে অন্ধ ভিখারি বোঝায়।

দ্রব্যবিশেষের উৎপত্তিস্থলের নাম অথবা উদ্ভাবয়িতার নিজের নাম অথবা তাঁর প্রদত্ত নাম দ্রব্যনামে পরিণত হতে পারে। যেমন — Lady Canning এর নাম থেকে লেডিকেনি নামক মিষ্টি, Boycott নামক ব্যক্তি একঘরে হয়েছিলেন— তা থেকে boycott করা অর্থাৎ কোনো সম্পর্ক না রাখা। 'বিভীষণ' 'মিরজাফর' নামক বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অর্থ প্রসারই লক্ষ করা যায়। বাংলায় প্রহার অর্থে 'ধনঞ্জয়' শব্দ এসেছে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' শ্লোকে উদ্দিষ্ট গল্প থেকে। ভগবান রামচন্দ্রের পবিত্র নাম বৃহত্তরসূচক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত (রামছাগল, রামদা)। চৈতন্যের মতাবলম্বী বৈষ্ণবেরা শিখা রাখতেন বলে শিখার নামান্তর 'চৈতন'। মার্কিন = মোটা কোরা কাপড় > আমেরিকান। অনেক রাগরাগিনীর নামও দেশের নাম থেকে উৎপন্ন। চলতি কথায় উদো (= বোকা) এসেছে উদ্ধব নাম থেকে। কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে দূতরূপে পাঠালে, গোপীদের কৃষ্ণভর্ৎসনা উদ্ধব নীরবে সহ্য করেছিলেন।

একই স্থান-নাম একাধিক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বোঝাতে পারে। যেমন — বাংলায় চিনি (= মিষ্ট চূর্ণ) ও ইংরেজি China (মসৃণ পোড়ামাটির বাসনপত্র) একই দেশনাম 'চিন' থেকে আগত। কোনো স্থান থেকে আগত বস্তুর নামের সঙ্গে ওই স্থানের নামের যোগাযোগেও শব্দার্থের প্রসার ঘটে। ব্যাটাভিয়া থেকে 'বাতাবি লেবু', মিশর থেকে আগত 'মিশ্রি', চিন থেকে 'চিনি', সুপারক থেকে সুপারি, মার্তবান থেকে মর্তমান (কলা) ইত্যাদি।

৪.৪.১.২ অর্থসংকোচ

শব্দের অর্থসমষ্টির কোনো একটি প্রধান হয়ে উঠলে অপর অর্থগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে বিলুপ্ত হতে পারে। তখন কোনো শব্দের অর্থ একাধিক বস্তু বা ব্যাপক ভাবের পরিবর্তে একটিমাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় অর্থাৎ প্রাধান্যপ্রাপ্ত শব্দটি যদি সমষ্টিবাচক শব্দকে ব্যষ্টি অর্থে, সমগ্র থেকে অংশে কিংবা কারণবাচক শব্দ থেকে কার্যবাচক শব্দকে

বোঝায় তখন শব্দের অর্থ সংকোচ ঘটে।

যেমন — সংস্কৃত 'অন্ন' শব্দের অর্থ 'খাদ্য', কিন্তু বাংলায় বিশিষ্ট খাদ্য ভাত। সংস্কৃতে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ সাধারণ দীপ অথবা আলো, বাংলায় বোঝায় বিশেষ আকৃতির পাত্রে তৈলদাহ্য দীপ। প্রাচীন কালে আত্মীয় স্বজনের 'তত্ত্ব' বা 'সন্দেশ' অর্থাৎ কুশল বার্তা নেওয়ার উপলক্ষে মিষ্টান্ন উপহার পাঠনো হত। তা থেকে এরূপ মিষ্টান্ন উপহারের সাধারণ নাম হল 'তত্ত্ব' বা 'সন্দেশ'। এই অর্থে 'তত্ত্ব' শব্দটি এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ আরো সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ভাত', 'তত্ত্ব', 'সন্দেশ' -- এই উদাহরণগুলিতে অর্থ ভাববাচকতা থেকে বস্তুবাচকতায় পরিবর্তিত হয়েছে।

সাধারণ থেকে বিশেষ অর্থ পরিবর্তনের উদাহরণ -- মনুষ্য থেকে বাংলায় আগত মুনিস শব্দের অর্থ সর্বশ্রেণির মানুষ নয়, শুধুই দিন মজুর। পূর্ববঙ্গে 'গাভুর' (< গর্ভরূপ) = ছোকরা। বিশেষ থেকে সাধারণ অর্থ পরিবর্তনের উদাহরণও অপ্রতুল নয়। 'সিধা' শব্দটির মূল অর্থ সিদ্ধ অর্থাৎ রান্নার উপযুক্ত দ্রব্যাদি, অধুনা অর্থ চাল, ডাল, ঘি, নুন, কাচকলা ইত্যাদি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের অপক্ক খাদ্যসম্ভার। 'জলপানি' শব্দের মূল অর্থ লঘু আহার, জলখাবার, — এখন অর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রের বৃত্তি।

সম্বন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিই 'সম্বন্ধী' হওয়ার যোগ্য, কিন্তু অর্থসংকোচের ফলে হয়েছে শুধুই বড়োশ্যালক। কৃপণ শব্দের অর্থ ছিল কৃপার পাত্র, এখন একমাত্র ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তিকেই বোঝায়। মহোৎসব অর্থ মহান-উৎসব, কিন্তু বৈষ্ণবদের উৎসব-বিশেষই অধুনা 'মোচ্ছব'। ঠিক সেরূপ বিলাত অর্থ বিদেশ কিন্তু এখন বোঝায় শুধু ইংল্যান্ড। খাদ্য থেকে উৎপন্ন 'খাজা' এখন বিশেষ ধরনের খাবার, 'পর্ণ' অর্থাৎ পাতা থেকে জাত 'পান' শুধু এক বিশেষ জাতীয় পাতাকেই বোঝায়।

৪.৪.১.৩ অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ

অর্থের ক্রমান্বয়ে প্রসারণ ও সংকোচের ফলে অনেক সময় এমন অবস্থা হয় যে, মধ্যবর্তী অর্থটি লোপ পেয়ে শব্দটির যে অর্থ দাঁড়ায় তার সঙ্গে মৌলিক অর্থের যোগ দুর্লক্ষ হয়ে পড়ে। তখন মনে হয় শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে অন্য বস্তুতে সরে এসেছে। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ।

যেমন সংস্কৃতে 'ঘর্ম' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গরম', এখন বাংলায় বোঝায় 'ঘাম' বা 'স্বেদ'। 'গরম' থেকে 'শরীরের ওপর গরমের ফল', তা থেকে 'স্বেদ' — অর্থটি এভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। 'পাষণ্ড' শব্দের মৌলিক অর্থ ছিল 'ধর্মসম্প্রদায়', তা থেকে হয়েছে 'বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়' > বিরুদ্ধ ধর্মের উপাসক > ধর্মজ্ঞানহীন, অত্যাচারী। 'পাত্র' শব্দের মূল অর্থ 'পান করার আধার', তা থেকে অর্থবিস্তারের ফলে হয়েছে যে কোনো রকমের আধার, আবার অর্থসংকোচের ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'কন্যা দান করার আধার', এখন সংকীর্ণ অর্থ 'বর'। এখানে যেহেতু মূল অর্থের সঙ্গে বর্তমান অর্থের সংযোগ

সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই একে অর্থসংক্রম বলা যায়। 'চামচে' শব্দের অর্থ 'ছোটো হাতা', বর্তমানকালে তা থেকে হয়েছে 'তোষামোদকারী' বা 'অতি অনুগত ব্যাক্তি', এটিও অর্থসংক্রমের উদাহরণ। বাংলায় 'উজবুক' শব্দ এসেছে তুর্কি 'উজবেগ' (জাতিবিশেষের নাম) থেকে। বাংলায় মধ্যযুগে মুসলমান সৈনিকদের এক শ্রেণি ছিল 'অজ' এবং 'বোকা' শব্দানুষঙ্গ ও অর্থানুষঙ্গ যুক্ত হয়ে 'উজবুক' শব্দের বাংলা অর্থ হয়েছে 'মূর্খ গোঁয়ার'। অর্বাচীন সংস্কৃত এবং বাংলায় 'গলাধাক্কা দেওয়া' অর্থে 'অর্ধচন্দ্র' শব্দটি প্রচলিত আছে। গলা ধাক্কা দিতে গেলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর মধ্যবর্তী স্থান অর্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করে। অর্ধচন্দ্রাকৃতির একরকম অস্ত্রও সে যুগে ছিল। তা থেকেই এই অর্থ আগত। 'ভাত' শব্দের মূল অর্থ বরাদ্দ খাদ্যের প্রাপ্য অংশ, তা থেকে খাদ্য, বিশিষ্ট খাদ্য, সেদ্ধ চাল ইত্যাদি। 'ঘড়ি' শব্দের মূল অর্থ ছোটো ঘড়া বা অনুরূপ পাত্র। সেকালে অত্যন্ত সরু ডমরুমধ্যে পাত্রে বালু অথবা জল রেখে সেই বালু বা জলের নিম্নে পতনের সময় ধরে কাল (time) গণনা করা হত। সেই 'ঘটিকা' যন্ত্রই পুরোনো বাংলার 'ঘড়ি'। কিন্তু একালে 'ঘড়ি' বলতে যে সময় জ্ঞাপক যন্ত্র বোঝায় তার সঙ্গে ছোটো ঘড়ার দূরতম সম্পর্কও নেই।

ঘড়িয়াল শব্দটির অর্থও এই প্রসঙ্গে বিচারযোগ্য। আধুনিককালে ঘড়িয়াল > ঘড়েল বলতে বোঝায় চতুর, সতর্ক ব্যক্তি এবং এক শ্রেণির কুমির। ঘড়িয়াল শব্দটি এসেছে 'ঘটিকাপাল' থেকে, যে ব্যক্তি ঘটিকাযন্ত্রের দিকে নজর রাখে এবং উপযুক্ত সময়ে দণ্ডপ্রহর জ্ঞাপক ঘন্টা বাজায়, তা থেকে সতর্ক, চতুর, ব্যক্তি এবং একশ্রেণির চতুর কুমির —এই সমস্ত অর্থের উৎপত্তি।

'প্রবন্ধ' শব্দের মূল অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন যার', এখন রচনা মাত্রই প্রবন্ধ। 'সহজ' মানে 'সহজাত' তা থেকে 'অনায়াসসাধ্য'। 'পদার্থ' শব্দের মূল অর্থ 'পদের অর্থ', 'অভিধেয়' কিন্তু অর্থপরিবর্তনে বস্তুমাত্রই পদার্থ। 'পুরোহিত' শব্দের মূল অর্থ 'সম্মুখস্থিত অগ্নি' এখন অর্থ 'যজমানের পক্ষ অবলম্বনকারী পূজক'। 'মণ্ডপ' শব্দের মূল অর্থ 'মণ্ড পানকারী' --- সম্ভবত সবাই মিলে এক জায়গায় বসে মণ্ডপান করা হত, — তা থেকে সর্বসাধারণের মিলনস্থান অর্থে 'মণ্ডপ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দারুবৎ কঠিন ও রসহীন অর্থই 'দারুণ' শব্দের মূল অর্থ। তা থেকে ক্রমশ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, ভয়ানক, অতিশয় (দারুণ সুন্দর) অর্থ দাঁড়িয়ে গেল। 'প্রসাদ' শব্দের মূল অর্থ 'অনুগ্রহ', তা থেকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য বা নিবেদিত বস্তু। 'লৌহ' ছিল লাল রঙের ধাতু, তা থেকে হয়েছে বর্তমান 'লোহা' (Iron)। শুশ্রূষা মূল অর্থ 'শোনার ইচ্ছা', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'সেবা'।

৪.৪.২ অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ

শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ অপেক্ষা প্রচলিত অর্থ যদি উচ্চতর ভাব বা বিষয়কে প্রকাশ করে অর্থাৎ কোনো শব্দের অর্থ যদি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো তার চেয়ে সম্মানিত বা আদৃত ভাব বা বস্তুকে বোঝায়

তাহলে তাকে অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ বলা হয়।যেমন— 'বাতুল' শব্দের মূল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, উন্মাদ, পাগল। কিন্তু 'বাতুল' থেকে আগত 'বাউল' শব্দের অর্থ 'বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়'। তেমনি 'ভোগ' শব্দের মূল অর্থ উপভোগ বা খাদ্য সামগ্রী। কিন্তু দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হলে 'ভোগ' শব্দের অর্থোন্নতি ঘটে। 'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গৃহ', অর্থোন্নতির ফলে 'দেবগৃহ'। 'সম্ভ্রম'-এর মূল অর্থ 'ভয়' কিন্তু 'মান্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'স্থান' থেকে আগত 'থান' বলতে এখন শুধু দেবস্থানকেই বোঝায়।

৪.৪.৩ অর্থের অবনতি বা অর্থাপকর্ষ

শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ অর্থপরিবর্তনের ফলে যদি পূর্বাপেক্ষা হেয় বা তুচ্ছ বিষয়কে বোঝায় তবে ব্যপারটিকে বলা হয় অর্থের অবনতি বা অর্থাপকর্ষ।যেমন— 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ 'মহৎব্যক্তি'। কিন্তু 'মহাজন' শব্দে যখন মহাজনী কারবারিকে অর্থাৎ ঋণব্যবসায়ীকে বোঝায় তখন শব্দের অর্থাবনতি হয়েছে বলে রোঝা যায়। তেমনি মনুষ্য > মুনিস, শ্যালক > শালা, উপাধ্যায় > ওঝা > বোজা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ও অর্থাবনতি ঘটেছে।

পাষণ্ড শব্দের মূল অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটি সম্প্রদায়, অর্থবনতির ফলে এখন নিষ্ঠুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ইতর' শব্দের অর্থ অন্য, অপর, কিন্তু পরিবর্তিত অর্থ ছোটোলোক। 'প্রীতি' থেকে জাত 'পিরিতি' প্রেম অর্থে ব্যবহৃত হত, কিন্তু এখন এর অর্থ 'অবৈধ প্রেম'।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

শব্দার্থপরিবর্তনের ত্রিধারা কী? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

শব্দার্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থপ্রসার এবং অর্থোৎকর্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কতটুকু? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

অর্থসংকোচ এবং অর্থাপকর্ষের মধ্যে পার্থক্য কী? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

অর্থসংকোচ কাকে বলে? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) শব্দার্থপরিবর্তনের ত্রিধারা বলতে কী বোঝায়? এই ত্রিধারার অন্তর্গত শব্দার্থপরিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(সংকেত সূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

(খ) শব্দার্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থের উন্নতি এবং অর্থের অবনতি নামে স্বতন্ত্র দুটি ধারার অস্তিত্ব কতটুকু প্রয়োজনীয়? এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত দিন। প্রসঙ্গত এই দুটি ধারা শব্দার্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করেছে বুঝিয়ে লিখুন।

(সংকেত সূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

৪.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা শব্দার্থপরিবর্তনের কারণ এবং ধারা সমূহ আলোচনা করেছি। এবারে আসুন আমাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যাক।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি যে, ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষা ব্যবহৃত শব্দের অর্থসম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থতত্ত্ব বলে। শব্দার্থতত্ত্ব এবং শব্দার্থপরিবর্তন ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহারে শব্দার্থতত্ত্বের ভূমিকা ব্যাপক। সুদূর প্রাচীন কালের ইতিহাসের আভাসও শব্দার্থতত্ত্বের সাহায্যে পাওয়া যায়।

শব্দের অর্থপরিবর্তনে মানুষের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় প্রকাশিত হয়। এই অর্থপরিবর্তনের পেছনে সামাজিক অবস্থা পরিবেশ এবং মানবভাবনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমরা আমাদের আলোচনায় শব্দার্থপরিবর্তনের প্রধান কারণসমূহকে চিহ্নিত করেছি, বিশ্লেষণ করেছি এগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। আমরা দেখেছি যে শব্দার্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব, অলংকার প্রয়োগ, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শব্দার্থপরিবর্তনের ধারাসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন গবেষক শব্দার্থপরিবর্তনের বেশ কিছু ধারাকে চিহ্নিত করেছেন। এবিষয়ে অল্পবিস্তর মতানৈক্য থাকলেও প্রায় সকলেই অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, এবং অর্থসংক্রম, এই তিনটি

ধারাকে একত্রিত করে শব্দার্থপরিবর্তনের ত্রিধারা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। শব্দার্থপরিবর্তনের ধারাসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা অর্থের উন্নতি এবং অবনতির প্রসঙ্গ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। তবে এদুটি প্রসঙ্গ বৃহত্তরঅর্থে শব্দার্থপরিবর্তনের ত্রিধারারই অন্তর্গত।

৪.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

আব্রাহাম নোয়াম্ চম্স্কি (জন্ম ১৯২৮) : বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভাষাবিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হলেন আব্রাহাম নোয়াম্ চম্স্কি। জন্মসূত্রে তিনি ইহুদি। ব্যক্তিজীবনে তিনি মানবতাবাদী। পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর সময় থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের (Transformational Generative Grammar) তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ভাষার সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি ভাষার মনোগত দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাঁর তত্ত্বকে মনস্তত্ত্বপ্রধান তত্ত্ব বলা হয়।

৪.৭ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Question)

১) শব্দার্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে অর্থপরিবর্তন ঘটায় উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুণন ঃ ভাষায় বিনয় প্রকাশ; ভাবাবেগের আরোপ; সুভাষণ; অর্থসংশ্লেষ; আলংকারিক প্রয়োগ; অর্থের হীনতা বা অবনতি; ব্যঙ্গ; বিভিন্ন অর্থে একই শব্দের ব্যবহার; ভ্রম, অজ্ঞতা ও অনবধানতা।

২) শব্দের অর্থবিস্তার বলতে কী বোঝায়? এর সঙ্গে দেশ, কাল ও জাতির সংস্কৃতি কীভাবে জড়িয়ে থাকে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

৩) শব্দের অর্থসংকোচ কী, দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝিয়ে দিন এবং এই অর্থসংকোচজাত অর্থপরিবর্তনের পশ্চাতে কী কী কারণ থাকে তার উল্লেখ করুন।

৪) নিম্ন লিখিত মন্তব্যগুলি বিচার করুন :

(ক) ধ্বনিপরিবর্তনের সঙ্গে অর্থপরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। শব্দের ধ্বনিপরিবর্তিত হলেই অর্থ পরিবর্তন হয় না।

(খ) অর্থসংকোচ ও শব্দের হীনতাব্যঞ্জক অর্থ এক ব্যাপার নয়।

(গ) শব্দার্থ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজও সংস্কৃতির ইঙ্গিতবহ, যেমন — অসুর, গবাক্ষ।

৫) শব্দার্থপরিবর্তন কী বুঝিয়ে দিন। এই পরিবর্তনে যে সব কারণের ভূমিকা দেখা যায় তাদের উল্লেখ করুন ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি পরিস্ফুট করুন।

৬) শব্দার্থপরিবর্তনের ত্রিধারা কী বুঝিয়ে লিখুন এবং সেই সঙ্গে যে কোনো একটি ধারা অবলম্বনে শব্দার্থ কীভাবে পরিবর্তিত হয় দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৫
বাংলা উপভাষা

বিষয় বিন্যাস

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.২ উপভাষা : সজ্ঞা

৫.৩ উপভাষিক বিভাগ : লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য

- ৫.৩.১ রাঢ়ি
- ৫.৩.২ ঝাড়খণ্ডি
- ৫.৩.৩ বরেন্দ্রী
- ৫.৩.৪ বঙ্গালী
- ৫.৩.৫ কামরূপী

৫.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৫.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৫.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৫.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

ভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করলে দেখা যায় যে ভাষা হচ্ছে কিছু অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ, যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। যে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে ভাষাবিজ্ঞানীগণ তাকে একটি ভাষাসম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছেন।

যে নির্দ্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করা যায় সেই ধবনিসমষ্টির এই নির্দিষ্টক্রমে বিন্যস্ত করে শুধু একটি নির্দিষ্ট ভাষাসম্প্রদায়ই ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয় তা শুধু সেই বিশেষ ভাষাসম্প্রদায়ই বুঝতে পারে। এই একই ভাবপ্রকাশের জন্য আবার অন্য ভাষাসম্প্রদায় অন্য ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে।

অর্থাৎ একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান উপযোগী নয়। একেকটি ভাষা এক একটি জনসমষ্টির নিজস্ব প্রকাশমাধ্যম। অর্থাৎ একেকটি ভাষাসম্প্রদায় হচ্ছে একেকটি বিশিষ্ট ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের ব্যবহারকারী জনসমষ্টি। কিন্তু একেকটি ভাষাসম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে পারস্পরিক ভাববিনিময় করে সেই

ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ সমান হয় না। যেমন পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবাংলায় ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাই প্রচলিত, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি সম্পূর্ণ এক রকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই আঞ্চলিক পার্থক্যকেই বলা হয় আঞ্চলিক উপভাষা।

উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ রূপ যা একেকটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত। এরসঙ্গে আদর্শভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগধারাগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য যথেষ্ট সুস্পষ্ট এবং এই সুস্পষ্ট পার্থক্যের জন্যই একটি ভাষার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপগুলি স্বতন্ত্রভাবে ধরা পড়ে। এই পার্থক্য যদি বেশি হয় তাহলে এই আঞ্চলিক রূপগুলিই একেকটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ ভাষা এবং উপভাষার মধ্যে যে পার্থক্য তা চূরান্ত নয় আপেক্ষিক; শ্রেণিগত নয়, মাত্রাগত। একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপসমূহকে সেই ভাষার উপভাষা বলা হয়। কিন্তু এই আঞ্চলিক পার্থক্য বেশিমাত্রায় হলে আবার একই ভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক রূপগুলি তখন আর উপভাষা থাকে না, তখন সেগুলি একেকটি স্বতন্ত্রভাষা হিসাবে গণ্য হয়।

বস্তুত ভাষার আঞ্চলিক রূপ যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠে তখন সেগুলিকে আর উপভাষা না বলে ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

ভাষা এবং উপভাষার পার্থক্যের আপেক্ষিকতার মানদণ্ডে অনেকে বলেছেন যে একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষা আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা থাকে ততদিন সেই আঞ্চলিক রূপগুলিকে বলা হবে উপভাষা। যখন এই আঞ্চলিক রূপগুলি পৃথক হতে হতে পারস্পারিক বোধগম্যতার সীমা অতিক্রম করে তখন তাদের স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায়।

সাধারণত দেখা যায় ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত, উপভাষা আপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত। ভাষার একটি সর্বজনীন আদর্শরূপ থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজন নিজের অঞ্চলের পারস্পরিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু সাহিত্যে, শিক্ষায়, আইন-আদালতে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করে। তাই দেখা যায় যে একটি আদর্শ ভাষার এলাকার মধ্যে একাধিক উপভাষা প্রচলিত। সাধারণত উপভাষায় লোকসাহিত্যই বেশি রচিত হয়। তবে আঞ্চলিক লোকজীবনকে জীবন্তভাবে পরিবেশন করার জন্য আধুনিক কালের শিষ্ট সাহিত্যেও উপভাষার ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে। উপভাষাগুলিতে সাধারণত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বিশেষ রচিত হয় না, তেমনি এগুলির কোনো ব্যাকরণও সাধারণত লিখিত হয় না। কোনো উপভাষায় স্বতন্ত্র সাহিত্য-চর্চা ও তার ব্যাকরণ রচনার সচেতন প্রয়াস যখন সংঘটিত হয় তখন তা ক্রমে ভাষার মর্যাদা লাভ করতে থাকে।

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বর্তমান বিভাগে আমরা বাংলা ভাষা ও তার উপভাষা সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি। উপভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে প্রাথমিক ভাবে আমরা বাংলা উপভাষিক বিভাগ সমূহকে চিহ্নিত করব। এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের আলোচনা এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যাতে —

- উপভাষার সংজ্ঞা সম্পর্কে আপনারা একটা প্রাথমিক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- চিহ্নিত করতে পারবেন বাংলার উপভাষিক বিভাগসমূহকে।

৫.২ উপভাষা : সংজ্ঞা

আমরা আমাদের আলোচনার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে উপভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছি এবং প্রসঙ্গত ভাষা এবং উপভাষার পার্থক্য নির্ণয় করেছি। এবার এপ্রসঙ্গে আরো দু-একটি তথ্যের উল্লেখ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব।

প্রচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে কোনো আঞ্চলিক ভাষা-ধর্ম ছিল না বলেই অনুমান করা হয়। তবু বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাস্রোত যে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ নয়। তবে বিভিন্ন রচনার ভাষাগত উপাদানের মধ্যে যে একটি সার্বভৌম সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের যোগসূত্র ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তারও প্রমাণ রয়েছে। কালক্রমে বাংলা বাষার আঞ্চলিক লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং প্রায় আধুনিক কালে বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ধর্মের সুনিশ্চিত প্রমান পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ তথা বাংলা ভাষাভাষীর অঞ্চল বৃহদায়তন বলেই মৌখিক ভাষায় অঞ্চলভেদে বহুবিচিত্র রূপ পরিলক্ষিত হয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গঠিত ভাষাগুচ্ছকে উপভাষা হয়।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ভাষা সম্প্রদায় বলতে কী বোঝায়? (২৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

উপভাষা কী? (৪০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

উপভাষা এবং ভাষার মধ্যে সম্পর্ক কী? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

একটি উপভাষা কীভাবে ভাষায় পরিণত হতে পারে? (২৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৫.৩ উপভাষিক বিভাগ : লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য

বংলা ভাষার অন্তর্গত উপভাষাসমূহের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকমণ্ডলীর মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। অনেকদিন আগে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন তাঁর 'Linguisite Survey of India' গ্রন্থের প্রঞ্চম খণ্ডে বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা-বিভাষাসমূহের যে বিবরণ দিয়েছেন সেগুলির সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি,— যদিও গুচ্ছবদ্ধরূপে সেগুলিকে চার বা পাঁচ সংখ্যায় আবদ্ধ করা যায়। কিন্তু পণ্ডিত গ্রিয়ার্সনের এই উদ্যামের পরবর্তী কাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার কোনো উপভাষিক ব্যাকরণ রচিত হয়নি, হয়নি কোনো ভাষাগত ভৌগোলিক জরিপও। ফলে বাংলার উপভাষাগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনেকে 'রাঢ়ি-বঙ্গালী-বরেন্দ্রী-কামরূপী' এই চারটি উপভাষার কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ 'পাশ্চাত্য বা গৌড়ী' এবং 'প্রাচ্য বা বঙ্গীয়' এই দুটি প্রধান বিভাগে উপভাষাসমূহের ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে রাঢ়ি-ঝাড়খণ্ডি-বরেন্দ্রী-পশ্চিম কামরূপী-মধ্যপূর্বী এবং পূর্বদেশী, দক্ষিণপূর্বী, পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমা— এই আটটি ভাষা গুচ্ছ পূর্বোক্ত দুটি প্রধান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তবে নামে বা সংখ্যায় অনৈক্য থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে, বাঢ়ি এবং বঙ্গালী এই দুটি উপভাষাই বাংলার প্রধান উপভাষা এবং অন্যগুলি তাদের কোনো না কোনো একটির সঙ্গে নিকট সম্পার্কিত। এ বিষয়ে ড° সুকুমার সেন কৃত উপভাষা বিভাগেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তিনি স্থুলবিবেচনায় বাংলার উপভাষাগুলিকে নিম্নোত্তরূপে বিন্যস্ত করেছেন—

ক) রাঢ়ি (মধ্য পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা)

খ) ঝাড়খণ্ডি (দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা)

গ) বরেন্দ্রী (উত্তর বঙ্গের উপভাষা)

ঘ) বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা) এবং

ঙ) কামরূপী (উত্তর-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা)

আমরা একটি ছকের সাহায্যে বাংলার উপভাষাগুলি এবং তার প্রচলনস্থানসমূহকে চিহ্নিত করতে পারি এভাবে —

উপভাষা	**অবস্থান**
রাঢ়ি	মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ি-বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব-বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ি-কলকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)
বঙ্গালী	পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম)
	বরেন্দ্রী উত্তরবঙ্গ (মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা)।
ঝাড়খণ্ডি	দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ (মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর)
কামরূপী বা রাজবংশী	উত্তর-পূর্ব বঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছার শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা)।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

শহীদুল্লাহ্ নির্দেশিত বাঙলাভাষার পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য বিভাগের উপভাষাগুলির নাম দেওয়া যেতে পারে, যথাক্রমে গৌড়ী এবং বঙ্গীয়। কারণ, হিন্দু যুগের শেষ আমলে সাধারণত বাঙলার পশ্চিমাঞ্চল 'গৌড়ী' এবং পূর্বাঞ্চল 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হতো (অবশ্য কখনও কখনও অখণ্ড বাঙলাদেশ বোঝাতেও গৌড় কিংবা বঙ্গ নাম ব্যহৃত হয়েছে)।[১] মোটকথা, পাশ্চাত্ত্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রাচীন গৌড় এবং রাঢ় অঞ্চল, আর প্রাচ্য বিভাগের অন্তর্গত হলো প্রাচীন বঙ্গ।

বাঙলাভাষার পাশ্চাত্ত্য উপভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণগুলি হলো এই —

ধ্বনিতত্ত্ব : মহাপ্রাণ ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি, চ-বর্গ, ড়/ঢ় আদি হ্ — এগুলির প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষিত। শ, ষ, স স্থানে (কয়েকটি যুক্ত ব্যঞ্জন ভিন্ন) 'শ' উচ্চারণ (প্রত্যন্ত-পশ্চিম অঞ্চলে 'স' উচ্চারণ)। পূর্ণ আনুনাসিকতা (চাঁদ, কাঁদে ইত্যাদি)।

রূপতত্ত্ব : কর্মকারকের একবচনে-ক, কে। অতীত কালের প্রথম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়ার -এ বিভক্তি। ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষে -বে বিভক্তি।

প্রাচ্য উপভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

ধ্বনিতত্ত্ব : চ-বর্গের দন্ত্য-ঘৃষ্ট উচ্চারণ। শ, ষ, স স্থানে (যুক্ত ব্যঞ্জন ব্যতীত) 'হ' ধ্বনি। মূল 'হ' লোপ। মহাপ্রাণ ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ (ঘ, ধ, ভ > গ, দ, ব)। অর্ধআনুনাসিকতা (চান্দ, কান্দে ইত্যাদি)। অপিনিহিত-জনিত পরিবর্তন।

রূপতত্ত্ব : কর্মকারের একবচনের - রে বিভক্তি। ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষ- ব। অতীত কালের সকর্মক ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের রূপ সাধুভাষার ন্যায় (কোনও কোনও স্থলে হসন্ত উচ্চারণ)। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার অতীত-কালের প্রথম পুরুষ অভিন্ন এবং নিত্যবৃত্ত কালের মধ্যম পুরুষের তুচ্ছ প্রয়োগে -ই কালের প্রথম পুরুষ অভিন্ন এবং নিত্যবৃত্ত কালের মধ্যম পুরুষের তুচ্ছ প্রয়োগে -ই (কর্‌তি = করতিস্‌)

(বাংলা ভাষা পরিক্রমা: পরেশচন্দ্র মজুমদার)

একএকটি উপভাষার অভ্যন্তরেও নানা আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। একএকটি উপভাষার মধ্যে এরকম যে নানা আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে উঠে তাকে বিভাষা বলে। বাংলার উপভাষাগুলির মধ্যে বাঢ়ি ও বাঙ্গালীর বিস্তৃতি বেশি। তাই এই দুটি উপভাষার অভ্যন্তরে একাধিক বিভাষা লক্ষ করা যায়। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান উপভাষা বাঢ়ি। যদিও সাধারণভাবে বাঢ়ির প্রধান বিভাগ দুটি, পূর্ব ও পশ্চিম, তবু সূক্ষ্ম বিচারে বাঢ়ির চারটি বিভাগ। এগুলি হল (ক) পূর্ব-মধ্যঃ কোলকাতা, পূর্ববীরভূম, হুগলি, বাঁকুড়া। (গ) উত্তর-মধ্যঃ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ মালদহ। (ঘ) দক্ষিণ-মধ্যঃ উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (ডাইমণ্ডহারবার)।

পূর্বে বঙ্গালীর দুটি বিভাষা ছিল — (ক) বিশুদ্ধ বঙ্গালী (ডাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, বরিশাল, খুলনা এবং যশোহর), (খ) চট্টগ্রামী (চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি)। এখন এই দুটি বিভাষার মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে চট্টগ্রামের লোকের ভাষা ঢাকার লোক প্রায় বুঝতেই পারে না।

বাংলা ভাষার উপভাষাগুলির প্রত্যেকটির কিছু কিছু নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যই একটি উপভাষা অন্য উপভাষা থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে।

বাংলার পাঁচটি উপভাষা এবং তাদের প্রচলন স্থানসমূহ আমরা চিহ্নিত করেছি। এবারে আসুন এই উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা যাক।

৫.৩.১ রাঢ়ি

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

(ক) ই, উ, ক্ষ এবং য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও এর মতো। যেমন - অতি > ওতি, মধু>মোধু, লক্ষ > লোক্‌খো, অতুল

> ওতুল ইত্যাদি। অন্যক্ষেত্রেও অ-কারের ও-কার প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন - মন > মোন, বন > বোন ইত্যাদি।

(খ) অপিনিহিতির পরবর্তী অভিশ্রুতি রাঢ়ি উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন করিয়া > কইর‍্যা > করে।

(গ) রাঢ়িতে স্বরসংগতির ফলে শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত বিষম স্বরধ্বনি সম স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গেচে। যেমন — দেশী > দিশি ইত্যাদি।

(ঘ) শব্দমধ্যস্থ নাসিক্যব্যঞ্জন যেখানে লুপ্ত হয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যিভবন ঘটেছে। যেমন বন্ধ > বাঁধ, চন্দ্র > চাঁদ, বংশ > বাঁস ইত্যাদি। কোথাও কোথাও নাসিক্যব্যঞ্জনের অনুপস্থিতিতেও স্বরধ্বনির স্বতনাসিক্যিভবন দেখা যায়। যেমন - পুস্তক > পুথি > পুঁথি, ইষ্টক > ইট > ইঁট ইত্যাদি। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের বিভাষায় আনুনাসিকের অস্থানে আগম প্রচুর। যেমন - বাঁকুড়া-মানভূম-বীরভূম হঁইছে, চাঁ।

(ঙ) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয়। যেমন — দুধ > দুদ, মাছ > মাচ্, বাঘ > বাগ্ ইত্যাদি।

(চ) শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষধ্বনি কখনো কখনো সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন — ছত্র > ছাত > গলৎ > গলদ। অন্যদিকে শব্দান্তে অবস্থিত ঘোষধ্বনি কখনো অঘোষ। রূপে উচ্চারিত। যেমন — ফরাসি গুলাব > গোলাপ।

(ছ) 'ল' কোথাও কোথাও 'ন' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন — লাও > নাউ, লুচি > নুচি।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) কর্তৃ কারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে 'দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন — কর্মকারক — আমাদের বইদাও করণ কারক — তোমাদের দ্বারা একাজ হবে না।

(খ) রাঢ়িতে গৌণকর্মের বিভক্তি 'কে' এবং মুখ্যকর্ম বিভক্তিহীন। যেমন — আমি রামকে টাকা ধার দিয়েছি। সম্প্রদান কারকেও 'কে' বিভক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন — দরিদ্রকে অর্থদান করো।

(ঘ) সদ্য অতীত কালে প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি '-ল', যেমন — সে গেল; কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি '-লে', যেমন — সে

দিলে। সদ্য অতীত কালে উত্তমপুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লুম'। যেমন — আমি কিনলুম।

(ঙ) যৌগিক ক্রিয়াপদে '-ই' অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা অসম্পন্ন কাল এবং '-ইয়া' অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন কাল গঠন। যেমন — করিছে > করছে, করিছিল > করছিল (অসম্পন্ন), করিয়াছে > করেছে, করিয়াছিল > করেছিল (সম্পন্ন)। পশ্চিমা রাঢ়িতে '-ল' যুক্তি সম্পন্নকাল (গেলছিল = গিয়াছিল) এবং অস্তর্থক 'বট্' ধাতুর ব্যবহার (তোমার নাম কি বটে?)।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

একই ভাষা ঐতিহাসিক কারণে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে একাধিক উপভাষায় যেমন রূপান্তরিত হয়, তেমনি কোনো কোনো উপভাষাও ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয় বা সাংস্কৃতিক অথবা অপর বিশেষ কোনো সুযোগ লাভ ক'রে একটি 'কেন্দ্রীয় উপভাষা'র মর্যাদা লাভ করে। বিভিন্ন ঔপভাষিক অঞ্চলের অধিবাসীরাও নিজেদের ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক বা জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনে 'কেন্দ্রীয় উপভাষা অঞ্চলে'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হয় বলে এই 'কেন্দ্রীয় উপভাষা'ই সমগ্র ভাষা পরিবারের 'আদর্শ কথ্যভাষা' (Stanadard Colloquial Language) বা 'চলিত ভাষা' -রূপে গৃহীত হয়। এমনকি, সাহিত্যে চলিত ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হ'লে এই 'আদর্শ কথ্যভাষা'ই তৎস্থলবর্তী হয়। বাঙলা ভাষাকে প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করলে দেখতে পাই, খ্রি: দশম শতকের পূর্বে এই পূর্বাঞ্চলে* মাগধী অবহট্‌ঠ-জাত' কিংবা 'গৌড়ী প্রাকৃতজাত' একটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সৃষ্টি হ'লেছিল; বাঙলা, আসাম এবং উড়িষ্যার তারই বিভিন্ন ঔপভাষিক রূপ প্রচলিত ছিল। তারপর ক্রমে বাঙলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়া স্বাতন্ত্র্য অর্জন ক'রে নিজেরাই এক একটি পরিপূর্ণ ভাষা হ'য়ে দাঁড়ায়। এটি অনুমানসিদ্ধ তত্ত্ব। পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরা আমরা জানি। বাঙলা ভাষা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন উপভাষায় পরিণত হ'য়েছে। তিনশত বৎসর পূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর তীরে কলকাতা পত্তনের পর থেকে ক্রমে তার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। পূর্বভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হ'য়ে দাঁড়ায় কলকাতা। অতএব কলিকাতার তথা ভাগীরতীর সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষা অর্থাৎ রাঢ়ি উপভাষা কালে কালে কেন্দ্রীয় উপভাষা'র মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। শিষ্টজনের মুখে এই উপভাষাই কিছুটা মার্জিত হ'য়ে 'শিষ্ট কথ্যভাষা' বা 'আদর্শ কথ্যভাষা' তথা 'প্রমিতভাষা' (Standard Colloquial Language) -রূপে সাহিত্যে 'চলিত ভাষা' - রূপে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। এই 'আদর্শ কথ্যভাষা'র প্রভাব রাজনৈতিক সীমা এবং উপভাষা অঞ্চলেরও সীমা অতিক্রম ক'রে পূর্ববঙ্গেও (বর্তমানের স্বাধীন 'বাঙলাদেশে'ও) 'শিষ্টভাষা'র মর্যাদা লাভ করেছে।

(ভাষাবিদ্যা পরিচয়: পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য)

৫.৩.২ ঝাড়খণ্ডি

ঝাড়খণ্ডি অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষাগুচ্ছ তিনটি প্রধান স্তবকে বিভক্ত। মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তরপূর্বাংশের কথ্যভাষা রাঢ়ির অন্তর্গত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম কথ্যভাষাগুলিকে দণ্ডভুক্তীয় স্তবক বলা যায়, আর মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তের ধলভূমের এবং মানভূমের কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্ডি বলা যায়। ঝাড়খণ্ডি প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) আনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন — উঁট, হাঁতি, সাঁপ ইত্যাদি।

(খ) 'ও' - কারের 'অ' - কার প্রবণতাও ব্যপক। যেমন — লেক > লক, চোর > চর, বোকা > বকা ইত্যাদি।

(গ) অপিনিহিতি কোথাও সংরক্ষিত, কোথাওবা দুর্বল হয়েছে, কিন্তু লোপ পায়নি। যেমন — কালি > কাইল, সন্ধ্যা > সাঁইঝ > সাঁইঝ ইত্যাদি।

(ঘ) অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে মহাপ্রাণ উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— দুর > ধুর ইত্যাদি।

(ঙ) প্রায়সই র > ল এবং ন > ল। যেমন — নাতিপুতিরা > লাতিপুঁতিলা, লোকেরা > লক্লা, নয় > লয়, নাতি > লাতি ইত্যাদি।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) বহুবচনে ওড়িয়া ভাষার প্রভাবজাত '-মন্'/'-মেন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার — তাঁদের > তারমন্কার।

(খ) কর্মে ও সম্প্রদান কারকে '-কে' বিভক্তি, বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে উদ্দেশ্য বোঝাতেও সম্প্রদান কারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন — জলের জন্য গেছে > জল্কে গেল্ছে; ঘরকে চল। অপাদান কারকে '-উ' বিভক্তি এবং '-লে' ও '-ঠে' অনুসর্গীয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন — ঘর থেকে > ঘর লে, ঘরঠে।

(গ) অধিকরণ কারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন — রাতকে জাড়াবে।

(ঘ) প্রচলিত সর্বনাম ছাড়াও অতিরিক্ত 'মুই', 'হামরা', 'মোনে' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াপদে স্বার্থক '-ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন — করলেক, হবেক ইত্যাদি।

(ঙ) নাম ধাতুর বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন — পুখুরের জলটা গাঁধচ্ছে, মাথাটা দুখাচ্ছে ইত্যাদি।

(চ) যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ' ধাতুর বদলে 'বট' ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন — করিবটে।

(ছ) যৌগিক প্রয়োজক ক্রিয়ার ব্যবহার এই উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য — উঠা পারানো (উঠানো) আনা করানো (আনানো)

(জ) নঞর্থ উপসর্গ ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন নাই যাব, নাইহয় ইত্যাদি।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

বাংলার উপভাষা কয়টি ও কী কী? সেগুলির প্রচলনস্থান চিহ্নি করুণ। (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

বিভাষা কী? রাঢ়ি এবং বঙ্গালীর বিভাষা কয়টি এবং কী কী? (৭০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

প্রমিতভাষা কাকে বলে? বাংলার কেন্দ্রীয় উপভাষা কোনটি? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৫.৩.৩ বরেন্দ্রী

উত্তর বঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিম বঙ্গর উপভাষা রাঢ়ির মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। কারণ এদুটি প্রথমে একটি উপভাষাই ছিল। পরে উত্তর বঙ্গের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা বঙ্গালী ও বিহারের ভাষার কিছু স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়।

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) বরেন্দ্রীর স্বরধ্বনি অনেকটা রাঢ়িরই মতো। স্বরধ্বনি প্রায় অপরিবর্তিত

থাকলেও '-অ্যা' ধ্বনিরও আগম ঘটেছে। যেমন — অ্যাক, দ্যান ইত্যাদি। আনুনাসিক স্বরধ্বনি রাঢ়ির মতো বরেন্দ্রীতেও রক্ষিত আছে।

(খ) ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্পপ্রাণ হয়ে গেচে। যেমন বাঘ্ > বাগ্।

(গ) বরেন্দ্রীতে স্বাসাঘাতের কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান নেই।

(ঘ) বঙ্গালীর প্রভাবে 'জ' কার কখনো কখনো 'জ' (হ) রূপে উচ্চারিত হয়।

(ঙ) পদের গোড়ায় 'র' কারের লোপ ও আগম এই উপভাষার একটি বিসিষ্ট লক্ষণ। যেমন — আমের রস > রামের অস।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) শ্বদ ও ধাতুরূপে বরেন্দ্রী মোটামুটি রাঢ়িরই মতো, তবে অধিকারণে কামরূপী সুলভ '-ত' বিভক্তিও দেখা যায়। য়েমন — ঘরে > ঘরত।

(খ) অতীত কালে উত্তমপুরুষে এই উপভাষায় '-লাম' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন — খেলাম।

৫.৩.৪ বঙ্গালী

বঙ্গালী উপভাষা যথেষ্ট বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত এবং এর মধ্যে বৈচিত্র্যও প্রচুর। এই উপভাষাকে দুটি গুচ্ছে বিভক্ত করা যায়। একটি গুচ্ছে রয়েছে— ঢাকা, মৈমন সিং, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর ও পশ্চিম শ্রীহট্ট এবং নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কাছাড় ও পূর্বশ্রীহট্ট অন্যগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। এই উপভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ—

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) বঙ্গালীর স্বরধ্বনিতে প্রাচীনত্ব অনেকটা রক্ষিত 'অ' - স্থানে 'ও' -কার প্রবণতা নেই। তবে 'ও' -কার স্থানে 'উ' -কার এবং 'এ' - কার স্থানে 'এ্যা' - কার উচ্চারিত হয়। যেমন — চোর > চুর, ভোর > ভুর, দেশ > দ্যাশ, মেঘ > ম্যাঘ, তেল > ত্যাল ইত্যাতি। সংবৃত 'এ' এখানে বিবৃত 'এ্যা' রূপে উচ্চারিত।

(খ) অপিনিহিতি এই উপভাষায় পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। যেমন — আজি > আইজ, করিয়া > কইর‍্যা, কালি > কাইল। যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বে, বিশেষত 'ক্ষ', 'ঘ'-ফলা, 'জ্ঞ' প্রভৃতির পূর্বে একটি হ্রস্ব 'ই' ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন — বাক্য > বাইক্ক, যাও > যইগ্গা, রাক্ষস >

রাইক্‌খস, ব্রাঘ্র > ব্রাইম্ম ইত্যাদি। অভিশ্রুতি নেই, স্বরসংগতির পরিমানও খুব কম।

(গ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ হয় না, ফলে এই রকম লোপের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিক্যিভবনের প্রক্রিয়া বঙ্গালীতে দেখা যায় না। যেমন চন্দ্র > চান্দ। সানুনাসিক স্বরধ্বনিরও একান্ত অভাব। যেমন - পাঁচ> পাচ, হাঁস > হাস।

(ঘ) ঢোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ কণ্ঠনালীয় স্পর্শযুক্ত তৃতীয় ধ্বনিতে অর্থাৎ 'অবরুদ্ধ ধ্বনি'তে পরিণত হয়। যেমন ভাত > বা'ত, ঘা > গা', ঘর > গ'র। 'হ'-কারও তার মহাপ্রাণত্ব হারিয়ে কণ্ঠনালীয় ধ্বনিতে পরিণত হয় — হাতি > আ'ত্তি, হাঁটু > আ'ঠু।

(ঙ) চ, ছ, জ প্রভৃতি ঘৃষ্টধ্বনি বঙ্গালীতে প্রায় উষ্ণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন — চ > ৎস, ছ >স, জ > জ (z)।

(চ) ড়, ঢ় > র, যেমন — বাড়ি > বারি, আষাঢ় > আশার ইত্যাদি।

(ছ) 'স' এবং 'শ' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়। যেমন — শাক > হাগ, সে > হে।

(জ) শব্দের আদিতে ও মধ্যে 'হ' স্থানে 'অ' উচ্চারিত হয়। যেমন — হয় > অয়।

(ঝ) শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, অনেক সময় শ্বাসাঘাত থাকে না, তবে স্বরাঘাত থাকে।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) সকর্মক অকর্মক নির্বিশেষে সর্বপ্রকার ক্রিয়ার কর্তাতেই '-এ' বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। যেমন রামে গিছে। গৌণকর্ম ও সম্প্রদাণে '-রে' বিভক্তি — আমাদের কও, ল্যাংরারে ভিক্ষা দ্যাও। করণ কারকে '-এ' বিভক্তি ছাড়াও 'দিয়া', 'সাথে' 'লগে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার, অপাদানে '-থে', '-থন', থিক্যা' প্রভৃতি অনুসর্গ বা অনুসর্গীয় বিভক্তি যুক্ত হয়, অধিকরণ কারকের বিভক্তি '-এ' এবং '-ও' — বারিৎ যাও, ঘরিৎ কয়ডা বাজে।

(খ) বহুবচনের প্রত্যয় '-রা', '-গুলাইন', তির্থককারকে বহুবচনে '-গো' বা '-রা' প্রত্যয় যোগ করে পরে বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। যেমন — তাগোরে, আমরার, তোমাগোরে। কোনো কোনো বিভাষায় একবচনে নির্দেশক প্রত্যয় '-ডা' (< - টা) এবং বহুবচনে '-ডি' (< - টি) ব্যবহৃত হয় গরুভিরে (গরুগুলোকে), ছাগলডা (ছাগলটা)।

(গ) ক্রিয়রূপের গঠন বৈশিষ্ট্য হল রাঢ়িতে যা সাধারণ বর্তমানের রূপ বঙ্গালীতে তা ঘটমান বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন — মায়ে ডাকে (= মা ডাকছে)

(ঘ) সদ্যঅতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লাস' — আমি খালাস।

(ঙ) রাঢ়ী উপভাষার ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি বঙ্গালীতে পুরাঘটিত বর্তমানের বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন — আমি করসি (< করছি, = আমি করেছি)।

(চ) মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি '-উম্' ও '-মু। যেমন — আমি যামু (= আমি যাব); আমি খেলুমনা (= আমি খেলবনা)।

(ছ) অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্ন কালের মূল ক্রিয়াটি পূর্বে বসে, অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন রাম গ্যাসেগিয়া (= রাম চলে গেছে)

৫.৩.৫ কামরূপী

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য অধিক। কারণ কামরূপী হল উত্তরপূর্ববঙ্গের উপভাষা এবং বরেন্দ্রী হল উত্তর বঙ্গের ভাষা, সুতরাং দুয়র মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য রয়েছে। কিন্তু কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর সাদৃশ্য কম, কারণ বরেন্দ্রী আসলে বাঢ়িরই একটি বিভাগ। বরেন্দ্রীর তুলনায় বঙ্গালী সঙ্গে কামরূপীর সাদৃশ্য বেশি।

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) সঘোষ প্রহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ শব্দের আদিতেই শুধু বজায় আছে, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই তা অল্পপ্রাণে পরিণত হয়েছে। যেমন — সম্ঝা-সম্ঝি > সম্জা- সম্জি।

(খ) তালব্য বর্ণ অর্থাৎ চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলো এই উপভাষায় উষ্ণীভূত হয়েথে (জ > Z)

(গ) শ, ষ, স প্রায়শই বঙ্গালীর মতো 'হ'- কারে পরিণত হয়েছে।

(ঘ) ড় > র, ঢ় > রহ্। কিন্তু এই প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায় না। কোচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' অপরিবর্তিত হয়েছে। যেমন — বাড়ির।

(ঙ) রাঢ়ি যেমন শব্দের আদিতে স্বাসাঘাত পড়ে, কামরূপীতে তেমন নয়, কামরূপীতে শ্বাসাঘাত শব্দের মধ্যে এবং অন্তেও পড়ে।

(চ) 'ও' কখনো কখনো 'উ' রূপে উচ্চারিত হয় — তোমার > তুমার।

তবে এই প্রবণত সর্বত্র সুলভ নয়।

(ছ) আদি 'র' ধ্বনির বর্জন এবং স্বরধ্বনির সংরক্ষণ যেমন — রাজা > আজা, রাগ > আগ।

(জ) কখনো ল > ন। যেমন — লাউ > নাউ, লাল > নাল। তবে বিষমীভবনের ফলে 'ন' ও 'ল' রূপে উচারিত হয়। যেমন জননী > জলনী, সিনান > সিলান।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষে '-নু' এবং প্রথম পুরুষে '-ইল' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন — সেবা কন্নু (= সেবা করলাম), কহিল (= বলায়)।

(খ) উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম 'মুই', 'হাম'।

(গ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-ত'। যেমন — পাছৎ।

(ঘ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি '-র' '-ক'। যেমন বাপোক (বাপের), ছাগলের। গৌণকর্মের বিভক্তি '-ক' । যেমন — 'হামাক্' (আমাকে)

(ঙ) '-ল' যুক্ত ভাববচন — আসিল্ ভালে (= আসার সময়)

(চ) নঞর্থ উপসর্গের ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহার। যেমন — না যাওঁ, না লিখিম্।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

রাঢ়ি ও বরেন্দ্রী এবং বঙ্গালী ও কামরূপী উপভাষার মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য কী? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

বঙ্গালী উপভাষার প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুণ? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন :

বাংলা উপভাষা কয়টি ও কী কী? দুটি উপভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করুণ।

(সংকেত সূত্র : প্রসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

.....

.....

.....

.....

৫.৪ আলোচিত বিষয়ে সারসংক্ষেপ

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি এবার আমাদের সামগ্রিক আলোচনার দিকে একবার পেছন ফিরে তাকানো যেতে পারে।

আমরা আমাদের আলোচনার প্রথমেই উপভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছি। আমরা দেখেছি যে উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ বিশেষ রূপ যা এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত। সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে এই ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্‌ধারাগত পার্থক্য আছে। একই ভাষার অর্ন্তগত পৃথক আঞ্চলিক রূপসমূহকে তার উপভাষা বলা হয়, কিন্তু এই আঞ্চলিক পার্থক্য অতি মাত্রায় প্রকট হলে একই ভাষা থেকে আবার একাধিক ভাষার জন্ম হয়। আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকে তখন এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে গণ্য করতে হয়।

কোনো ভাষা যে বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত, তার উপভাষা গুলি সেই অঞ্চলের বিভন্ন স্থানে প্রচলিত। উপভাষা নির্দিষ্ট ঔপভাষিক অঞ্চলের মানুষের পারস্পরিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ ভাষাই ব্যবহৃত হয়। উপভাষায় লোক সাহিত্যই বেশি রচিত হয়।

বংলা ভাষার উপভাষা সমূহের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ প্রচুর। সদর্থে বাংলা ভাষার উপভাষাগত ভৌগোলিক জরিপ আজ পর্যন্ত করা হয়নি, ঔপভাষিক ব্যাকরণও রচিত হয়নি, তাই উপভাষার সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো সঠিক সিদ্ধেন্তে পৌঁছানো যায় না। ড° সুকুমার সেন বাংলার পাঁচটি উপভাষাকে চিহ্নিত করেছেন, তিনি এগুলোকে উপভাষাগুচ্ছ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা এই পাঁচটি উপভাষার প্রচলনস্থান সমূহ চিহ্নিত করেছি; আলোচনা করেছি এই উপভাষাগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ।

৫.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

গ্রিয়ার্সন : সম্পূর্ণ নাম জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন (১৮৫১ - ১৯৮১)। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন রাজকর্মচারী। সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা এবং জনজীবন সম্পর্কে তিনি অপরিসীম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বিহারি ভাষার বিভিন্ন উপভাষা এবং বিভাষা সম্পর্কে Seven Grammars of the Diatects and Sub-diatects of Bihari Language রচনা করেন। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় ভাষা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান একাশদ খণ্ডে রচিত Linguistic Survey of India। এর বিভিন্ন খণ্ডে সমগ্র উত্তর ভারতের নব্যভারতীয় আর্য-ভাষার আঞ্চলিক রূপ, তাদের উপভাষা ও বিভাষা, দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষা এবং এর আঞ্চলিক ভাষা সমূহ, নিষাদ বা অস্ট্রিক ভাষাসমূহ এবং উত্তরপূর্ব ভারতের তিব্বতি-বর্মি গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

৫.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১) বাংলা ভাষায় প্রচলিত উপভাষাগুলির উল্লেখ করুন। এগুলির মধ্যে দুটি প্রধান উপভাষার পারস্পরিক পার্থক্য সমূত্র গুলি নির্দেশ করুন।

২) বাংলা উপভাষাগুলির বর্ণনা দিন ও সেই সঙ্গে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করুন।

৩) ভাষাতাত্ত্বিক উদাহরণসহ বাংলার প্রধান প্রধান উপভাষাগুলির পরিচয় দিন। 'এগুলির কোনোটিই একটি বিশেষ উপভাষা নয়, প্রত্যেকটি কতকগুলি ঘনিষ্ট আঞ্চলি কথ্যভাষার সমষ্টি।' — মন্তব্যটি আলোচনা করুন।

৫.৭ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৬

বাংলা ভাষা : ধ্বনিসংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহ ও ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি

বিষয় বিন্যাস

৬.০ ভূমিকা (Introduction)

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৬.২ ধ্বনির পরিবর্তন

৬.২.১ ধ্বনিরপরিবর্তনের কারণ

৬.২.১.১ বহিঃ প্রভাবের কারণ

৬.২.১.২ শারীরিক কারণ

৬.২.১.৩ মানসিক কারণ

৬.২.২ ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা বা প্রকৃতিসমূহ

৬.২.২.১ বিবর্তনমূলক ও সংযোগমূলক ধ্বনিপরিবর্তন

৬.২.২.২ মনোবিষয়ক ধ্বনিপরিবর্তন

৬.৩ ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি

৬.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৬.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৫.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৬.০ ভূমিকা (Introduction)

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম উপজীব্য হল কাল-পরম্পরায় ভাষার পরিবর্তনের ধারার বিশ্লেষণ ভাষার এই পরিবর্তন দুরকমভাবে হতে পারে, তার দেহে এবং আত্মায়-- তার বহিরঙ্গ গঠনে এবং তার অন্তরঙ্গ বক্তব্যে। ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের মূল উপাদান হল ভাষার ধ্বনি এবং তার অন্তরঙ্গ বক্তব্য হচ্ছে তার অর্থ। তাই ভাষার পরিবর্তনের দুটি প্রধান দিককে চিহ্নিত করা হয়েছে , ধ্বনিপরিবর্তন এবং অর্থপরিবর্তন। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের প্রসঙ্গটি।

ভাষা পরিবর্তনশীল। ভাষা বস্তুত অখণ্ড স্রোতে চলমান এবং তা নিয়ত গতিপথ পরিবর্তন করতে চায়। ভাষার পরিবর্তন মূলত ধ্বনিপরিবর্তন। এই ধ্বনিপরিবর্তনের প্রবাহকে অনুসরণ করলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সূত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ভাষায় কালক্রমে যে ধ্বনিপরিবর্তন সংঘটিত হয় তা বিশেষ বিশেষ নিয়মের মধ্যে ধরা যায়। যেমন - সংস্কৃত (জতু, মধু, বধূ, সখী) রূপান্তরিত হয়ে বাংলায় হয়েছে (জউ, মউ, বউ,সই)। এই উদাহরণ

থেকে ধ্বনিপরিবর্তনের এই সূত্র অনুধাবন করা যায় যে, সংস্কৃতের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী (ত, ধ, খ) ইত্যাদি ব্যঞ্জনধ্বনি আধুনিক বাংলায় লুপ্ত হয়েছে। প্রাচীন বাংলা (রাতি, পাঁতি, আশু, ফাগু) আধুনিক বাংলায় হয়েছে (রাত, পাঁত, আশ, ফাগ)। এ থেকে এইসূত্র আবিষ্কৃত হয় যে, প্রাচীন বাংলায় অন্ত্য ই-কার, উ-কার আধুনিক বাংলায় (বিশেষত পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায়) লুপ্ত হয়েছে।

তবে ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্রসমূহ আইনের মতো অলঙ্ঘনীয় নয়, ভাষা সম্প্রদায়ের উচ্চারণ রীতিরই সাময়িক প্রকৃতির নির্দেশক। তাই এই সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। ভাষার জন্ম ও বিকাশ হয়েছে মানুষের সাময়িক বোধ ও অন্তরপ্রেরণা থেকে। মানুষের মনের বাইরে ভাষার অস্তিত্ব নেই, তাই মানুষের মনের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা অনুযায়ী ভাষার নিয়মশীলতার ব্যতিক্রম হতে পারে।

নিয়মের ব্যতিক্রমের বিষয়টি বাদ দিলে উপর্যুক্ত সমস্ত প্রসঙ্গই আমাদের এই পর্বের আলোচনার অন্তর্গত। ধ্বনিপরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখব যে বিভিন্ন কারণবশতই ভাষার এই ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে থাকে। বিভিন্ন সূক্ষ্ম ভাগকে বাদ দিলে ধ্বনিপরিবর্তনের তিনটি প্রধান কারণকে চিহ্নিত করা যায়। ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকৃতিসমূহ সাধারণভাবে এই তিনটি প্রধান কারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বক্ষ্যমাণ বিভাগে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলা ভাষার ধ্বনিবিষয়ক পরিবর্তনসমূহ। এই বিভাগে আমরা ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ ও প্রকৃতিসমূহ বিশ্লেষণ করব। এই আলোচনার মাধ্যমে—

- আপনারা ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন কারণসমূহ অনুধাবন করতে পারবেন।
- ধ্বনিপরিবর্তনের প্রকৃতিসমূহের আলোচনার দ্বারা আপনারা এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আলোচনার শেষে আপনারা ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ এবং প্রকৃতিসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- ব্যঞ্জন ব্যবহিত ধ্বনি সম্পর্কে অবগত হবেন।

৬.২ ধ্বনিপরিবর্তন

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভাষার পরিবর্তন প্রধানত ধ্বনিপরিবর্তন; নদী প্রবাহের মতোই অখণ্ড গতিতে এই পরিবর্তন চলতে থাকে। বক্তার মুখ থেকে নিঃসৃত

বাক্য বা ধ্বনিসমষ্টি শ্রোতার কানে প্রবেশ করে স্নায়ুতন্ত্রীর সাহায্যে মস্তিস্কে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তারই ফলে শ্রোতা বক্তার বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারে। এই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক রকম স্খলন এবং ত্রুটি ঘটতে পারে। কিন্তু সেগুলো এত সূক্ষ্ম যে সাধারণভাবে বা সহজে তা অনুভবে ধরা যায় না। এইভাবে পরম্পরাক্রমে চলতে চলতে একসময় মূলের সঙ্গে পরিবর্তিত ধ্বনির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কোনো শব্দের ধ্বনিপরিবর্তনের স্বরূপটি অনুধাবন করতে গেলে শব্দটির মূলরূপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। যেমন - সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ, উপকারিকা > উঅআরিআ>উয়াড়ি - ইত্যাদি শব্দে আমরা ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাটি অনুধাবন করে তার পরিবর্তনের কারণ নির্ণয়ে সচেষ্ট হতে পারি। বিশেষভাবে লক্ষ করলে ধ্বনিপরিবর্তনের কতকগুলো নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করা যায়। কোনো ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র কোনো বিশেষ ভাষার বিশেষ অবস্থাতেই প্রযোজ্য। এই সূত্র নির্বিশেষে প্রযোজ্য হতে পারে না। অর্থাৎ বাংলাভাষার ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রযোজ্য, ইংরেজির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে শব্দের মধ্যে ধ্বনিগুলির সুনির্দিষ্ট সংস্থানেই সূত্রানুসারী পরিবর্তন ঘটতে পারে, অন্যথা নয়। যেমন - পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে প্রাচীন বাংলার অন্ত্যই-কার ও উ-কার আধুনিক বাংলায় লুপ্ত হয়েছে। এই সূত্র পূর্ববঙ্গের উপভাষায় প্রযোজ্য নয়, এখানে ধ্বনি দুটি লুপ্ত হয় না, স্থান পরিবর্তন করে। সুতরাং প্রাচীন বাংলায় (আজি, কালি) স্থলে পশ্চিমবঙ্গে (আজ, কাল) এবং পূর্ববঙ্গে (আইজ, কাইল) হয়েছে।

৬.২.১ ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণসমূহকে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে থাকেন, ফলে এ বিষয়ে ঐকমত্য আশা করা যায় না। তবে সাধারণভাবে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য একটি সিদ্ধান্তে পণ্ডিতগণ উপনীত হয়েছেন। ধ্বনিপরিবর্তনের দুটি প্রধান কারণকে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন-- একটি বাহ্য কারণ, অপরটি আভ্যন্তর কারণ। অনেক সময় এই দুটি কারণই যুগপৎ বর্তমান থাকতে পারে। বাহ্য পরিবর্তনের অন্তর্গত কারণসমূহ হচ্ছে -- (১) ভৌগোলিক প্রভাব, (২) সামাজিক প্রভাব, (৩) ঐতিহাসিক কারণ বা স্বাভাবিক বিকাশ, (৪) ভিন্ন ভাষার প্রভাব, (৫) ব্যক্তিগত প্রভাব ও (৬) লিপি-বিভ্রাট। আভ্যন্তর কারণগুলোর দুটি স্থূল বিভাগ রয়েছে-- (ক) বহিরঙ্গ বা শারীরিক কারণ এবং (খ) মানসিক কারণ। বক্তার জিহ্বার জড়তা, শ্রোতার শ্রবণশক্তির অপ্রখরতা, পরিচিত অপর কোনো ভাষার ধ্বনির প্রভাব, ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণের অনুকরণ প্রভৃতিকে বহিরঙ্গ বা শারীরিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অল্পায়াস প্রবণতা, উচ্চারণ-সৌকর্য ইত্যাদি মানসিক কারণের অন্তর্ভুক্ত। ধ্বনিপরিবর্তনের অপর একটি প্রধান কারণ সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য এবং বিভ্রান্তিকে মনস্তাত্ত্বিক কারণের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অনবধানতা, বিশুদ্ধি প্রবণতা ইত্যাদিও এই বিভাগের অন্তর্গত।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ অনেকরকম, বক্তার জিহ্বার জড়তা, শ্রোতার শ্রবনশক্তির অপ্রখরতা, পরিচিত অন্য ভাষার ধ্বনির প্রভাব, ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণের অনুকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এসব কারণ বহিরঙ্গ, ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণ বৈষম্যের হেতু। তবে এইরকম ব্যক্তিগত উচ্চারণ-বৈষম্যই ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়া ব্যপক পরিবর্তন আনিয়া সর্বজনের গ্রাহ্য হইয়া দাঁড়ায়। বয়স্ক লোকের সঙ্গে থাকিয়া শিশু যখন ক্রমে ক্রমে ভাষার অধিকার লাভ করিতে থাকে তখন তাহার পরিবেশে আত্মীয়স্বজন দাসদাসীর কথাই সে অনুকরণ করিতে থাকে। তাহার পর শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সেই অধিগত ভাষারীতি, উচ্চারণে ও পদপ্রয়োগে বিকৃতি থাকিলে সে সব সমেত, সে তাহার বিশিষ্ট পরিবেশে ব্যবহার করিতে থাকে এবং এইভাবে তাহা পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এইরূপে ভাষাবিকার পুরুষান্তরক্রমে ব্যক্তি হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী হইতে সমাজে-- এইভাবে সঞ্চারিত হইতে থাকে।"

[ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন]

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ধ্বনিপরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? (৪০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণসমূহ কী কী? (৪০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৬.২.১.১ বহিঃপ্রভাবজাত কারণ

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলির আলোচনায় আমরা ধ্বনিপরিবর্তনের বহিঃপ্রভাব-জাত কারণসমূহ চিহ্নিত করেছি। এবারে আসুন সেগুলি এক-এক করে বিশ্লেষণ করা যাক।

ভৌগোলিক প্রভাব :

ভৌগোলিক অবস্থান বা পরিবেশগত অবস্থা কোনো দেশ বা জাতির ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বর্হিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ভাষা-ভাষী সম্প্রদায় যদি দীর্ঘকাল একই স্থানে বর্তমান থাকে, তবে অন্য-ভাষা-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে না আসার ফলে তাদের ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়। সাধারণত মনে করা

হয় যে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদের উচ্চারণে বিবৃত ধ্বনি কম থাকে এমন কি যাদের উচ্চারণে বিবৃত ধ্বনি বর্তমান, তারাও যদি দীর্ঘকাল শীতপ্রধান দেশে বাস করে, তবে তাদের ধ্বনিও ক্রমশ সংবৃত রূপ লাভ করে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটে। অবশ্য এই মতবাদ সর্বজনস্বীকৃত নয়।

জলবায়ুর প্রভাবও ভাষার উপর রয়েছে বলে অনেক মনে করেছেন। যেখানকার ভূ-প্রকৃতি রুক্ষ-কঠোর সেখানকার ভাষায় কর্কশতা ও কঠোরতা বেশি এবং সেখানকার ভূ-প্রকৃতি বর্ষাস্নিগ্ধ কোমল সেখানকার ভাষায় কোমলতা ও মাধুর্য বেশি বলে অনেকে মনে করেন। তাই জার্মান ও ইংরেজি ভাষা অপেক্ষাকৃত কর্কশ আর ফরাসি ও ইতালীয় ভাষা অপেক্ষাকৃত মধুর। এই সূত্রগুলি যদিও সার্বিক স্বীকৃতি পায়নি, তবু এ কথা বলা চলে যে, আরবি ভাষায় কণ্ঠ্যধ্বনির প্রাধান্য এবং বাংলা ভাষায় তরলধ্বনির প্রাধান্যের পশ্চাতে যথাক্রমে মরুভূমি ও নদনদীর বাহুল্য অকারণ নাও হতে পারে।

সামাজিক প্রভাব :

দেশের সামাজিক অবস্থা ধ্বনির গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করে। যে দেশে সাধারণত শান্তি বিরাজমান, সেখানে উচ্চারণের বিকৃতি কম। অন্যদিকে যে সমস্ত দেশকে যুদ্ধবিগ্রহে অধিক সময় লিপ্ত থাকতে হয়, তাদের শব্দোচ্চারণ এবং বিশেষ বিশেষ অংশে গুরুত্ব আরোপের ফলে ধ্বনিপরিবর্তনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

ঐতিহাসিক কারণ বা স্বাভাবিক বিকাশ :

নদীর মতো ভাষাও জীবন্ত বলে তার মধ্যে কালের গতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। ইতিহাসের ধারায় এই পরিবর্তন ঘটে বলে একে ধ্বনির বিকৃতি না বলে ধ্বনির বিকাশ বলাই সংগত।

ভিন্ন ভাষার প্রভাব :

দুইটি ভাষা সম্প্রদায়ের সংস্রব ঘনিষ্ঠ হলে একটি ভাষা অপর ভাষা থেকে শব্দ ও ইডিয়ম গ্রহণ করে। সংস্রব দীর্ঘস্থায়ী হলে এক ভাষার ধ্বনিগত বিশেষত্ব অপর ভাষায় সঞ্চারিত হতে পারে। বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সময় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। ইংরেজ-শাসনের দিনগুলিতে প্রচুর ইংরেজি শব্দ ও ইডিয়ম বাংলা ও ফারসির স্থান দখল করেছে।

ব্যক্তিগত প্রভাব :

কোনো পরিবার অথবা ব্যক্তিবিশেষে উচ্চারণরীতি অপর কোনো ব্যক্তির অথবা সামগ্রিকভাবেই ভাষার ধ্বনিতে পরিবর্তন আনতে পারে। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের আবাসিকদের মুখে 'ল' এবং 'শ' এর বিশিষ্ট উচ্চারণ লক্ষ করা যায়।

প্রত্যেক দলের ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাষায় অর্থাৎ ছোটোখাটো উপভাষায় এমন কিছু বিশিষ্টতা থাকে যা অন্যদলে বা গোষ্ঠীতে পাওয়া যায় না। এই

বিশিষ্টতাগুলিই উপভাষার বীজ। দেখা যায় যে, কোনো দলের উপভাষার মূলে আছে সেই দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশিপ্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির অথবা পরিবারের বিশেষ বাচনভঙ্গি। অর্থাৎ সেই ভাষার বিশেষত্বের শিকড়টি নিহিত আছে ব্যক্তি অথবা পরিবার বিশেষের বাক্-ব্যবহারে।

লিপিবিভ্রাট :

কোনো ভাষার শব্দ অন্য কোনো ভাষায় লিখতে গেলে সমবর্ণের অভাবে কাছাকাছি উচ্চারণে নিয়ে আসা হয়, তার ফলে ধ্বনিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। যেমন — ইংরেজির কল্যাণে বাঙালি 'বসু'হয়েছেন 'বোস'/'বাসু', 'কলকাতা' হয়েছে 'ক্যালকাটা'। আরবি ভাষায় 'প' অক্ষর না থাকায় তাদের লেখায় 'পারশি' হয়েছে 'ফারশি' এবং এখন 'ফারসি'ই প্রচলিত।

৬.২.১.২ শারীরিক কারণ

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ হিসাবে ভাষাবিজ্ঞানীগণ কিছু শারীরিক কারণকেও চিহ্নিত করেছেন। আমরা সেই কারণগুলি আমাদের আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বাগযন্ত্রের ত্রুটি :

বাগযন্ত্রে কোনো ত্রুটি থাকলে অনেক ধ্বনি পরিবর্তন ঘটতে পারে। বক্তার উচ্চারণে ত্রুটি ঘটলে ধ্বনিবিকৃতি সাধিত হয় এবং সেই ধ্বনিবিকৃতিই প্রচলন লাভ করলে ভাষার ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন — 'লক্ষ্মী' শব্দের যুক্তব্যঞ্জন 'ক্ + ষ্ + ম্' বাংলায় পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে শুধু 'ক্ + খ্', আর 'ম্' লুপ্ত হয়েছে এবং উচ্চারণ হয়েছে 'লোক্‌খি'।

শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি :

বক্তার দিক থেকে উচ্চারণের ত্রুটির ফলে যেমন ধ্বনিবিকৃতি হতে পারে, শ্রোতার দিক থেকে শ্রবণের ত্রুটির ফলেও ধ্বনিবিকৃতি ঘটতে পারে। বিদেশী ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের ধ্বনিবিকৃতি ও ধ্বনিপরিবর্তন এই কারণে হতে পারে। যেমন জার্মান 'Zar' শব্দটি বাংলায় হয়েছে 'জার', কিন্তু আসলে 'Zar'-এর মূল জার্মান উচ্চারণ 'ৎসার্'।

অনুকরণে অক্ষমতা :

সাধারণত অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে দুরুচ্চার্থক্ষ শব্দ বা বিদেশী শব্দ উচ্চারণে অমতা প্রকাশ পায় এবং তার ফলে ধ্বনিপরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে। যেমন — উষ্ট্র > উট্র / উষ্টক (কালিদাস প্রথম জীবনে এরূপ উচ্চারণ করেছিলেন বলে কথিত আছে)।

উচ্চারণ-দ্রুতি :

খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলে শব্দের মধ্যস্থ কোনো কোনো অক্ষর স্খলিত হয়ে পড়ে ও ধ্বনিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। যেমন পণ্ডিতমশাই > পোন্‌শাই।

অল্পায়াস প্রবণতা/প্রযত্নলাঘব :

শব্দের উচ্চারণকে সহজ করার উদ্দেশ্যে কখনো যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে, কখনো সমীকৃত করে, কখনোবা নতুন ধ্বনির আগম ঘটিয়ে অথবা অন্যবিধ উপায়ে ধ্বনিতে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। স্কুল > ইস্কুল।

৬.২.১.৩ মানসিক কারণ

ধ্বনিপরিবর্তনের মানসিক কারণসমূহকে নিম্নোক্তভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

শ্বাসাঘাত/অনবধানতা :

শব্দের গোড়ায় শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্যধ্বনিতে আমরা আর বেশি জোর দেবার কষ্ট স্বীকার করি না। তখন সেই শ্বাসাঘাতহীন ধ্বনিটি ক্ষীণ হয়ে যায় বা তার সঙ্গে যুক্ত স্বরটি লুপ্ত হয়। যেমন — গামোছা > গাম্‌ছা। অসাবধানতা বা সাবধানতার অভাবের ফলেও ধ্বনিরপরিবর্তিত হতে পারে। এর ফলে শব্দেরঅন্তর্গত একটি ধ্বনি উচ্চারণ করার পরে অন্যধ্বনি উচ্চারণে যাবার পথে জিহ্বা মাঝখানে একটি ভুঁইফোড় ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলে। যেমন — সংস্কৃত বানর থেকে প্রাচীন বাংলা বান্দর — এখানে 'ন্' ও 'র্'-এর মাঝখানে যে 'দ্' ধ্বনিটি এসেছে সেটি অনবধানতার জন্যই এসেছে।

অজ্ঞতা :

অজ্ঞতাহেতু যথাযথ উচ্চারণে অক্ষমতার ফলে অথবা ভুল শব্দকে শুদ্ধ ভেবে উচ্চারণ করতে গেলে ধ্বনিপরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন - ব্যাজ(Badge)>ব্যাচ, উচ্চারণ>উশ্চারণ।

লোকনিরুক্তি :

অপরিচিত বা বিদেশী শব্দকে পরিচিত শব্দের সাদৃশ করে উচ্চারণ করবার চেষ্টায় ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। যেমন - Hospital>হাঁসপাতাল।

ভাবপ্রবণতা :

ভাবপ্রবণতার জন্য কোনো কোনো শব্দে অতিরিক্ত ধ্বনি যোজনা করে তাকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়, তাতেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। যেমন - মামা>মামু, দুষ্ট>দুষ্টু।

বিশুদ্ধি প্রবণতা :

সাধুভাষার শব্দ কঠিন এবং দুরুচ্চার্য হয় --এই ধারণায় সহজ শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ বিবেচনা করে তাকে শুদ্ধ করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ শব্দকেও অশুদ্ধ করে তোলা হয়।

অন্ধবিশ্বাস/কুসংস্কার :

কোনো কোনো শব্দ সংস্কারবশত উচ্চারণের যোগ্য না হলে তাকে বিকৃত করে উচ্চারণ করার ফলে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। যেমন - সাগু>সাবু।

শব্দদৈর্ঘ্য :

বড়ো শব্দকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে তাতে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন - বাই-সাইকেল>বাইক।

অন্যমনস্কতা :

বক্তার অন্যমনস্কতাহেতু পর পর শব্দের উচ্চারণে বর্ণবিপর্যয় ঘটে গিয়ে ধ্বনিপরিবর্তন সৃষ্টি করে। যেমন- এক কাপ চা>এক চাপ কা, হাতে ছাতি>ছাতে হাতি।

কবিতার মাত্রা/কোমলতা :

কবিতার মাত্রার জন্য অথবা কোমলতার জন্য শব্দে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন - জন্ম>জনম।

সাদৃশ্য :

ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনে সাদৃশ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত শুধু ধ্বনিপরিবর্তনে নয়, ভাষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য সমানভাবে ক্রিয়াশীল। শব্দের রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন, পুরোনো শব্দের নতুন অর্থ উৎপাদন এবং নতুন শব্দ সৃষ্টিতেও সাদৃশ্য সদা-সক্রিয়।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ু ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

অন্যান্য ভাষার প্রভাবে কীভাবে ধ্বনিপরিবর্তন হয়? (৩০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাগযন্ত্র ও শ্রবণযন্ত্রের ভূমিকা কী? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

শ্বাসাঘাতের অবস্থান কীভাবে ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে? (৪০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

ধ্বনিপরিবর্তনের প্রধান তিনটি কারণ কী কী? এই তিনটি প্রধান কারণের সূক্ষ্ম স্তরসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৬.২.২ ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা বা প্রকৃতিসমূহ

কথা বলবার সময় ধ্বনিগুলো পৃথকভাবে পর পর উচ্চারিত হলেও মনের মধ্যে সেগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে আসে। সুতরাং উচ্চারণের সময় পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে এবং পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করতে পারে। আবার উচ্চারণের দ্রুততার জন্য কিংবা উচ্চারণ-প্রযত্ন শিথিল করবার চেষ্টার ফলে পরপর উচ্চারিত দুটি ধ্বনির মধ্যে একটির বা দুটিরই বিকৃতি ঘটতে পারে। শ্বাসাঘাতের তীব্রতার জন্যও ধ্বনির বিকৃতি কিংবা লোপ হয়। এইভাবে শব্দ এবং পদের মধ্যে নানারকম ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। ধ্বনিপরিবর্তনের প্রবণতাগুলি প্রধানত দুই রকম হলেও অন্যভাবেও চিহ্নিত করা যায়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"নানারকম কারণেই শব্দ-মধ্যে যে সকল ধ্বনিপরিবর্তন সাধিত হয় যত্ন সহকারে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিতে পারলেই ধ্বনিপ্রবৃত্তিগুলো আবিষ্কার করা কঠিন নয়। এগুলো ধ্বনিপ্রবৃত্তি মাত্র ---প্রাচীন ব্যবহার দেখে এদের বিচার করতে হয়; এগুলোকে ধ্বনিসূত্র বা ধ্বনিনিয়ম বলা সঙ্গত নয় এই কারণে যে, যদি এগুলো নিয়ম হয় তবে প্রত্যেক শব্দ ভবিষ্যতে কোন্‌রূপে পরিণতিলাভ করবে, তা আমরা বলে দিতে পারতাম। কিন্তু কার্যতঃ তা সম্ভব নয় --এই কারণেই এগুলোকে ধ্বনিসূত্র না বলে ধ্বনিপ্রবৃত্তি বলাই উচিত।"

[ভাষাবিদ্যা পরিচয় : পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য]

ধ্বনিপরিবর্তনের দুটি মূল ধারা কল্পনা করা যায়-- একটি বিবর্তনমূলক ও সংযোগমূলক, অপরটি মনোবিষয়ক। মনোবিষয়ক ধ্বনিপরিবর্তনের অন্তর্গত ধ্বনিপরিবর্তনসমূহের মধ্যে রয়েছে কিছু সাদৃশ্যমূলক ও কিছু বিভ্রান্তিমূলক।

৬.২.২.১ বিবর্তনমূলক ও সংযোগমূলক ধ্বনিপরিবর্তন

বিবর্তনমূলক ও সংযোগমূলক ধ্বনিপরিবর্তনের তিনটি প্রধান ধারা — ধ্বনি-বিলোপ, ধ্বনি-আগম ও ধ্বনি-রূপান্তর। এই তিনটি প্রধান ধারার অন্তর্গত আরো অনেক সূক্ষ্ম পরিবর্তনসমূহ রয়েছে, আমরা এবার এক-এক করে সেগুলো বিশ্লেষণ করব।

ধ্বনি বিলোপ :

এই পর্যায়ভুক্ত ধ্বনিপরিবর্তনের প্রধান কারণ শ্বাসাঘাত। এই পর্যায়ে দেখা যায় যে, বিশেষ কোনো অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়লে অপর অক্ষর দুর্বল হয়ে ক্রমশ লুপ্ত হয়। উচ্চারণ-দ্রুতির ফলেও কোনো অক্ষর বাদ পড়ে যেতে পারে।

(ক) **আদিস্বরলোপ**

সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না থেকে যদি শব্দের মধ্যবর্তী কোনো অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকে তবে আদিস্বরধ্বনিটি গৌণ হয়ে ক্রমশ ক্ষীণ উচ্চারিত হয় এবং শেষে লুপ্ত হয়। একেই আদিস্বরলোপ বলে। যেমন - অলাবু>লাউ, অভ্যন্তর>ভিতর, উদ্ধার>উধার>ধার।

(খ) **মধ্যস্বরলোপ**

সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী শ্বাসাঘাতহীন কোনো স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লুপ্ত হয়। একে মধ্যস্বরলোপ বলে। যেমন - সুবর্ণ>স্বর্ণ, রাঁধনা>রাঁধ্না>রান্না।

(গ) **অন্ত্যস্বরলোপ**

স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রায়ই শব্দের আদিস্বরে শ্বাসাঘাত থাকে এবং এর ফলে শব্দের শেষের দিকে অবস্থিত স্বর ক্ষীণ উচ্চারিত হয় এবং ক্রমশ লুপ্ত হয়। যেমন - অগ্নি>আগুন্, সন্ধ্যা>প্রাকৃত-সঞ্ঝা>সাঁঝ্।

(ঘ) **ব্যঞ্জনলোপ**

স্বরধ্বনি যেমন শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত্য যে কোনো স্থান থেকেই লুপ্ত হতে পারে, ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে তেমন হয় না। আদি ও অন্ত্য অবস্থান থেকে ব্যঞ্জনলোপের নিদর্শন প্রায় নেই। শব্দের আদিতে শুধু 'র' ধ্বনি লোপের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণত দুটি স্বরের মধ্যস্থান থেকেই ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়। যেমন সখী>সই, ফলাহার>ফলার।

(ঙ) **সমাক্ষরলোপ**

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমধ্বনির মধ্যে যখন একটি লুপ্ত হয়, তখন তাকে বলে সমাক্ষরলোপ। যেমন— বড় দাদা>বড়দা, পাদোদক>পাদোক।

ধ্বনি-আগম :

উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য শব্দের মধ্যে ধ্বনির আগম ঘটতে পারে। শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি আগমের স্থানভেদ অনুসারে স্বরধ্বনি আগমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) **আদিস্বরাগম**

উচ্চারণের সুবিধার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে পদের আদিতে যুক্ত অথবা একক ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে তাকে আদিস্বরাগম বলে। যেমন— স্পর্ধা>আস্পর্ধা। আধুনিক বাংলায় বহু ইংরেজি শব্দের রূপান্তরে আদিস্বরাগম লক্ষিত হয়। যেমন— আস্তাবল, ইস্টিশান ইত্যাদি।

(খ) **স্বরভক্তি/বিপ্রকর্ষ/মধ্যস্বরাগম**

উচ্চারণ প্রযত্ন লাঘবের জন্য অথবা অনভ্যস্ত ধ্বনিগুচ্ছ অভ্যাস অনুসারে সরল করতে গিয়ে কিংবা ছন্দের প্রয়োজনে অনেক সময় দুটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি এসে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটিকে বিশ্লিষ্ট করে দেয়। এমন স্বরাগমকে বলে বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি অথবা মধ্যস্বরাগম। বিপ্রকর্ষের উদাহরণ প্রাকৃতে প্রচুর রয়েছে। বাংলায় কাব্যের ভাষায় এবং গ্রাম্য উচ্চারণেও এর যথেষ্ট উদাহরণ সুলভ। যেমন— ভক্তি>ভকতি, ক্লেশ>কিলেশ(প্রাকৃত), প্রীতি>পিরীতি, ইং-গ্লাস(Glass)>গেলাস।

(গ) **অন্ত্যস্বরাগম**

কখনো কখনো শব্দের শেষে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়। এই ব্যাপারকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন— সং-পরিষদ>পালি-পরিসদা, সং-দিশ্>দিশা, বেঞ্চ>বাং-বেঞ্চি।

(ঘ) **ব্যঞ্জনাগম**

স্বরধ্বনির মতো প্রচুর না হলেও শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমও বিরল নয়। বাংলায় সাধারণত মধ্যব্যঞ্জনাগম সুলভ হলেও আদিব্যঞ্জনাগমের উদাহরণও ক্ষেত্রবিশেষে পাওয়া যায়। যেমন—

আদিব্যঞ্জনাগম : উজু>রুজু, ওঝা>রোজা।

মধ্যব্যঞ্জনাগম : সংবানর>প্রা.বা.বান্দর, ইংজেনারেল (General)> বাংজাঁদরেল।

অন্ত্যব্যঞ্জনাগম : সং.সর্ব+জি>সর্বজিৎ, ভূ+ভৃ>ভূবৃৎ।

(ঙ) **অপিনিহিতি**

যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে 'ই'-ধ্বনির আগম ঘটলে তাকে বলে অপিনিহিতি। যেমন— পূর্ববঙ্গের উপভাষায় সং.বাক্য>বাক্ক>বাইক্ক, সত্য>সত্ত>সইত্ত, ব্রাহ্ম>ব্রাইহ্ম ইত্যাদি।

তবে, অন্যমতে পরবর্তী 'ই'-কার বা 'উ'-কারের পূর্ববর্তী রূপে অতিরিক্ত উচ্চারিত হওয়াই অপিনিহিতি। অর্থাৎ অপিনিহিতিতে পদমধ্যস্থিত 'ই'-কার এবং 'উ'-কার স্বস্থানে থেকেও ঠিক আগের ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে একবার অতিরিক্ত উচ্চারিত হয়। যেমন— কাঁচি>কাঁইচি, গাঁতি>গাঁইতি।

কিন্তু বাংলায় অপিনিহিতির যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হয় সেগুলি আসলে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিপর্যাস মাত্র। যেমন — চারি>চাইর, মারি>মাইর, যাটি>যাইট ইত্যাদি।

(চ) **শ্রুতিধ্বনি**

উচ্চারণের সময় আমাদের জিহ্বা বিশ্রাম না নিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে এক ধ্বনির উচ্চারণ স্থান থেকে আরেকটি উচ্চারণস্থানের দিকে যায়। অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণে এক ধ্বনির স্থান থেকে পরবর্তী ধ্বনির স্থানে যাওয়ার সময় জিহ্বা অসতর্কভাবে একটি অতিরিক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলে। এইরূপ মধ্যব্যঞ্জনাগমকে বলে শ্রুতিধ্বনি। যেমন — সং.বানর>প্রা.বা.বান্দর>আ.বা.বাঁদর, সং.পঞ্চদশ>প্রা.পন্নরহ>হিন্দি.পন্দ্রহ।

য়-শ্রুতি : দ্রুত উচ্চারণের সময় সন্নিকৃষ্ট দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে একটি 'য়' ধ্বনির আগম ঘটলে ব্যাপারটিকে 'য়'-শ্রুতি বলে। যেমন— সাগর>সাঅর>সায়র, কে এলো>কেয়েলো।

ব-শ্রুতি : কখনো কখনো দুই স্বরধ্বনির মধ্যে একটি অতিরিক্ত 'ব'ধ্বনি (W উচ্চারণে) আসে। এই ঘটনাকে 'ব'-শ্রুতি বলে। যেমন — যা+আ প্রত্যয় = যাআ>যাওয়া। এইরূপ খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

ধ্বনি- রূপান্তর :

ধ্বনি যখন লুপ্ত হয় না বা যখন নতুন কোনো ধ্বনির আগম হয়না এবং যখন একটি ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য ধ্বনির রূপ লাভ করে তখন তাকে ধ্বনি-রূপান্তর বলা যায়। স্বর এবং ব্যঞ্জন উভয়বিধ ধ্বনিরই রূপান্তর সাধন হয়। স্বরধ্বনি রূপান্তরের প্রধান প্রক্রিয়া হল অভিশ্রুতি, স্বরসংগতি। ব্যঞ্জনধ্বনি বহু বিচিত্র প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হতে পারে। এদের মধ্যে প্রধান হল সমীভবন, বিষমীভবন ইত্যাদি।

(ক) **অভিশ্রুতি**

অপিনিহিতি অথবা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির বিকৃতি ঘটলে প্রক্রিয়াটিকে অভিশ্রুতি বলা হয়। অর্থাৎ অপিনিহিতির প্রক্রিয়ায় শব্দের অন্তর্গত যে 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসে সেই 'ই' বা 'উ' যখন পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার

সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন তাকে অভিশ্রুতি বলে। অভিশ্রুতি হল অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ। যেমন (করিয়া) থেকে অপিনিহিতির ফলে (*কইরিআ) অথবা মতান্তরে বিপর্যাসের ফলে (কইরা) > করে ; শুনিয়া > শুনে; বলিয়া > বইলা > বলে; হাটুয়া > *হাউটা> হেটো।

(খ) **স্বরসঙ্গতি**

ধ্বনিপরিবর্তনের কোনো নিয়ম অর্থাৎ অপিনিহিতি বিপর্যয় অথবা সন্ধি ছাড়াও অভিশ্রুতির মতো ধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। স্বরসঙ্গতিতে একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরধ্বনি বদলে যায়। সাধারণত উচ্চ স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এ (নিম্নাবস্থিত) + ই (উচ্চাবস্থিত) > ই+ই ; উ (উচ্চাবস্থিত) + আ (নিম্নাবস্থিত) > উ+ও। যেমন দেশী > দিশি; বিলাতি > বিলিতি ; নিরামিষ্য > নিরামিষি ; মূলা > মুলো।

স্বরসঙ্গতি চার ধরনের হতে পারে। (১) প্রগত (আদ্যস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে মূলা > মুলো ; শিকা > শিকে। (২) পারাগত (অন্ত্যস্বর অনুযায়ী আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে) : গোটা > গটা (উপভাষা) ; আখো (<*আখুয়া)> এখো(=ইক্ষুজাত); দেশী > দিশি; না- কি > নিকি (কথ্য)। (৩) মধ্যগত (আদ্য ও অন্ত্য অথবা আদ্য কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে) : বিলাতি > বিলিতি; বারেন্দা > বারান্দা (কথ্য)। (৪) অন্যোন্য (আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে) : মোজা > মুজো (উপভাষা)।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"মৌলিক স্বরধ্বনি ও স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে বিভিন্ন প্রকার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের জিহ্বা বিভিন্ন রকম অবস্থানে থাকে। দুটি পৃথক অবস্থানের স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের জিহ্বাকে মুখের মধ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটোছুটি করতে হয়। এই পরিশ্রম লাঘব করার জন্যে আমরা দু'টি পৃথক অবস্থানের ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সেই দু'টিকে যথাসম্ভব জিহ্বার একই রকম বা কাছাকাছি অবস্থান থেকে উচ্চারণ করে ফেলি; এরই ফলে স্বরসঙ্গতি সাধিত হয়। যেমন- 'সুপারি' উচ্চারণ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকে যখন 'সুপুরি' উচ্চারণ করে ফেলে তখন 'সুপারি' (স+উ +প্+আ+র+ই) শব্দের দু'টি পৃথক স্বরধ্বনি ('উ' এবং 'আ') পরিবর্তিত হয়ে 'সুপুরি'(স্+উ+প+উ+র+ই) উচ্চারণে একই রকম ('উ' এবং 'উ') স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়; লক্ষ করলে দেখা যাবে মূল শব্দের পৃথক্ স্বরধ্বনি দু'টোর ('উ'এবং 'আ') মধ্যে 'উ' উচ্চারিত হয় জিহ্বার উচ্চ অবস্থান থেকে আর 'আ' উচ্চারিত হয় জিহ্বার নিম্ন অবস্থান থেকে। এরকম দু'টি দূরবর্তী অবস্থান থেকে দু'টি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে হলে জিহ্বাকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে এই

যে ছুটে যেতে হয়,এর পরিশ্রমটুকু কমাবার জন্যে আমরা 'আ'কেও 'উ'তে রূপান্তরিত করে ফেলি, তার ফলে 'সুপারি' শব্দটি উচ্চারিত হয় 'সুপুরি' রূপে এবং 'সুপুরি' র দু'টি 'উ' এর উচ্চারণ স্থান একই হওয়ায় জিহ্বার পরিশ্রম লাঘব হয়। স্বরসঙ্গতিতে দু'টি পৃথক স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একেবারে একই রকম হয়ে গেলে তাকে পূর্ণ স্বরসঙ্গতি বলা যায়। যেমন-সুপারি > সুপুরি। স্বরসঙ্গতিতে অনেক সময় দু'টি পৃথক স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় না, প্রায় একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একে আংশিক স্বরসঙ্গতি বলা যায়। যেমন-পূজা (প্+উ+জ্+আ) > পূজো (প্+উ+জ্+ও)। 'ঊ'এবং 'আ' ছিল যথাক্রমে উচ্চ (High) এবং নিম্ন (Low) স্বরধ্বনি। এই দু'টির মধ্যে 'আ' পরিবর্তিত হয়ে 'উ' এর কাছাকাছি উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি (High-mid vowel) 'ও'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা আংশিক স্বরসঙ্গতি।"

[সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা: ড° রামেশ্বর শ]

(গ) **সমীভবন**

পদের উচ্চারণকালে অনেক সময় সন্নিকট দুটি বিভিন্ন ধ্বনি পরস্পর অথবা একে অপরের প্রভাবে অল্প বিস্তর সাম্য লাভ করে। এই ব্যাপারটিকে ধ্বনি বিজ্ঞানে সমীভবন বলা হয়। অর্থাৎ শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত দুটি বিষম ব্যঞ্জন ধ্বনি অর্থাৎ পৃথক ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একে অপরের প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনিতে বা প্রায় অনুরূপ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে সমীভবন।

সমীভবনে ধ্বনিপরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে সমীভবনকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(১) পূর্ববতী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে বদলে দিতে পারে, (২) পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে রূপান্তরিত করতে পারে, অথবা (৩) পরস্পরের প্রভাবে দুটি ধ্বনিই পরিবর্তিত হতে পারে। এই তিন প্রকার সমীভবনকে যথাক্রমে বলা হয় প্রগত, পরাগত এবং পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন। যেমন-

(১) প্রগত : পদ্ম > পদ্দ, গলদা > গল্লা (চিংড়ি)।

(২) পরাগত : সৎ+মান=সম্মান ; রাঁধনা > রান্না।

(৩) অন্যোন্য : উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস ; মহোৎসব > মোচ্ছব।

(ঘ) **বিষমীভবন**

বিষমীভবন সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় দুটি সংযুক্ত বা কাছাকাছি অবস্থিত সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে বিষম অর্থাৎ পৃথক ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন - পর্তুগিজ আর্মারিও (armario) > বাং. আল্‌মারি; লাল > নাল (বাংলার

গ্রাম্য উচ্চারণে); মার্মোর (marmor) > ইং. মার্বেল (marble)।

(ঙ) **বর্ণ বিপর্যয়/ বিপর্যাস**

পদমধ্যস্থিত দুটি ধ্বনিরস্থান পরিবর্তনকে বিপর্যাস বা বর্ণ বিপর্যয় বলা হয়। অর্থাৎ শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত বা সংযুক্ত দুটি ধ্বনি যদি নিজেদের মধ্যে স্থান বিনিময় করে তবে ধ্বনির সেই স্থান বিনিময়কে বিপর্যাস বলে। যেমন - ইংরেজি বক্স > বাং. বাস্ক; আরবি কুফ্ল > বাং. কুলুপ; রিক্সা > রিস্কা; পিশাচ > পিচাশ ইত্যাদি।

(চ) **ক্ষতিপুরক দীর্ঘীভবন**

যুক্ত অথবা যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি একটি মাত্র ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হলে এবং তার ফলে অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারিত হলে ব্যাপারটিকে বলা হয় ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন। শব্দের কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে অনেক সময় সেই লোপের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘস্বরে রূপান্তরিত হয়। যেমন - সং. ভক্ত >প্রা. ভত্ত > বাং. ভাত; সং. মৎস > প্রা. মচ্ছ > বাং. মাছ; সং. কর্ম > প্রা. কম্ম > বাং. কাম।

(ছ) **ঘোষীভবন**

সাধারণত বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি, য়্, র, ল, হ্, ড়, ঢ় এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হল সঘোষধ্বনি; এবং অন্য ধ্বনিগুলি অঘোষধ্বনি। কোনো সঘোষ ধ্বনির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি যদি সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে ঘোষীভবন বলে। যেমন - মকর > মগর; কাক > কাগ; দিক +বিজয় > দিগ্বিজয় ইত্যাদি।

(জ) **কণ্ঠনালীয়ভবন**

সাধারণত ফুসফুস চালিত বহির্মুখী বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট স্পর্শধ্বনি যদি রুদ্ধস্বর পথচালিত অন্তর্মুখী বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট অন্তঃস্ফোটক ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে কণ্ঠনালীভবন বলে। অর্থাৎ কোনো ধ্বনি উচ্চারণের শেষে কণ্ঠনালীর আকুঞ্চন হলে অর্থাৎ একটু ঢোক গেলার মতো প্রযত্ন হলে তাকে কণ্ঠনালীয়ভবন বলে। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো উপভাষায় ঘ,ধ,ভ ধ্বনিগুলি পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে অন্তঃস্ফোটক গ^{d} দ^{d} ব^{d} রূপে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনিগুলিকে কেউ কেউ অবরুদ্ধ ধ্বনিও বলেছেন।

(ঝ) **নাসিক্যীভবন**

কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ম, ন, ঙ ইত্যাদি) যদি ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশ লুপ্ত হয় এবং তার রেশ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে একটা অনুনাসিক অনুরণন যোগ হয় অর্থাৎ সন্নিকটস্থ নাসিক্য ধ্বনির প্রভাবে যদি স্বরধ্বনি নাসারন্ধ্রে অনুরণিত হয়ে নির্গত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন - বন্ধ > বাঁধ; চন্দ্র > চাঁদ; মাংস > মাঁস।

নাসিক্যব্যঞ্জনের সংস্রব ছাড়াও অনেক সময় স্বরধ্বনি অনুনাসিক হতে পারে। তখন সেই প্রক্রিয়াকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। যেমন - পুথি > পুঁথি; টেকসই > টেঁকসই; খোকা > খোঁকা; চা > চাঁ।

(ঞ) **মূর্ধন্যীভবন**

ঋ, র, ষ ইত্যাদি মূর্ধা - উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শে দন্ত্যব্যঞ্জন মূর্ধন্য উচ্চারিত হলে মুর্ধন্যীভবন হয়। যেমন - বৃদ্ধ > বুড্ঢ় > বুড়া; বিকৃত > বিকট ইত্যাদি।

ঋ, র, ষ ইত্যাদি ধ্বনির সংস্পর্শ ছাড়াই দন্ত্যব্যঞ্জন মূর্ধন্য উচ্চারিত হলে একে স্বতোমূর্ধন্যীভবন বলে। যেমন — সং.পততি > প্রা.পউই > বাং. পড়ে; উৎ+দীন > উড্ডীন ইত্যাদি।

(ট) **তালব্যীভবন**

জিহ্বাগ্র দ্বারা উচ্চার্য কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনিরউচ্চারণকালে জিহ্বার পশ্চাৎভাগ যদি তালুও স্পর্শ করে তবে তাকে তালব্যীভবন বলে। যেমন - ইং Education > এজ্যুকেশন; Institution > ইনস্টিচ্যুশন।

(ঠ) **সঙ্কোচন**

ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে যদি পাশাপাশি অবস্থিত অক্ষর সংখ্যা কমে যায় তবে এই পরিবর্তনকে সঙ্কোচন বলে। সাধারণত উচ্চারণ দ্রুততার জন্য অথবা উচ্চারণ প্রয়াস লাঘব করার জন্য অনেক সময় আমরা কোনো শব্দের সবকটি ধ্বনি পূর্ণ এবং স্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করে কতকগুলি ধ্বনিকে মিলিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করি। এর ফলে অধিক সংখ্যক ধ্বনি অল্প কয়েকটি ধ্বনিতে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। একেই সঙ্কোচন বলে। যেমন- সং সুবর্ণ > স্বর্ণ; সং পরিষদ > পর্ষদ ; যাহা ইচ্ছা তাই > যাচ্ছেতাই ইত্যাদি।

(ড) **বিস্ফোরণ বা প্রসারণ**

স্বরভক্তির ফলে বা অন্য কোনো উপায়ে এক অক্ষর একাধিক অক্ষরে পরিণত হলে একে বিস্ফোরণ বা প্রসারণ বলে। যেমন- সং পর্যঙ্ক > ব্রজবুলি পরিযঙ্ক।

(ঢ) **ব্যঞ্জনদ্বিত্ব**

শ্বাসাঘাতের জন্য অথবা বক্তার ইচ্ছানুযায়ী গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে একক ব্যঞ্জনের স্থানে যুগ্ম ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়। যেমন- ছোট > ছোট্ট; সকাল > সক্কাল; কত > কত্ত ইত্যাদি।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান প্রকৃতিগুলি কয়টি ও কী কী ? (৩০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

ধ্বনি-বিলোপ, ধ্বনি-আগম এবং ধ্বনি-রূপান্তরের মধ্যে পার্থক্য কী ? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

সমীভবন ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে ? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৬.২.২.২ মনোবিষয়ক ধ্বনিপরিবর্তন

মনোবিষয়ক ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান ধারা দুটি — একটি সাদৃশ্যমূলক এবং অপরটি বিভ্রান্তিমূলক। এগুলোকে একত্রে শব্দপ্রভাবিত এবং অর্থানুগত পরিবর্তন হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

সাদৃশ্য :

কথা বলার সময় ধ্বনিগুলি ছাড়া ছাড়া ভাবে এক একটি করে উচ্চারিত হয় না, ধ্বনিগুচ্ছ রূপে অর্থাৎ পৃথক পৃথক পদসত্তায় প্রবাহিত হয়। বাক্যের সমগ্র অর্থের দিকে মনোযোগ রেখেই পদ অর্থাৎ অর্থবান ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারিত হয়। বক্তার ও শ্রোতার মনোজগতে বাক্যবদ্ধ পদসমূহের পৃথক সত্তার বোধ থাকলেও সেগুলি মনের ভাণ্ডারে এলোমেলোভাবে ছড়ানো থাকে না,বরং থাকে থাকে বা খোপে খোপে গোছানো থাকে। বাঙ্ময় মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে পদভাণ্ডারকে অর্থের দিক দিয়ে যেন থাকে থাকে বা খোপে খোপে গুছিয়ে রাখা। সুতরাং কোনো খোপের সব পদ মনে না রেখে একটি বা দুটি পদ মনে রাখলেই হয়। আবশ্যক মতো এই পদগুলির ছাঁচে অপর পদ তৈরি করে নেওয়া যায়। এরূপে অর্থসম্বন্ধযুক্ত শব্দ বা পদসমষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য কোনো শব্দ বা পদের ধ্বনি অথবা অর্থ পরিবর্তন ঘটলে তাকে সাদৃশ্য বলে।

সাদৃশ্যর ফল প্রধানত চার রকম —

১/ শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন, ২/ শব্দের রূপ পরিবর্তন, ৩/ শব্দের অর্থ পরিবর্তন এবং ৪/নতুন শব্দ সৃষ্টি।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"গণিত-সূত্রের যেমন ব্যতিক্রম নাই, ধ্বনিপরিবর্তন-সূত্রের তেমন নয়। ভাষার জন্ম ও বিকাশ হইয়াছে মানুষের সামাজিক বোধ ও আন্তর প্রেরণা হইতে। মানুষের মনের বাহিরে ভাষার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানুষের মনের খেলা অনুযায়ী ভাষার

নিয়মশীলতার ব্যতিক্রম হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। ব্যতিক্রমের অবকাশ বেশি নাই, এবং ব্যতিক্রমের কারণও সাধারণত অজ্ঞেয় নয়। যেসাম্যবোধ আদিম মানবের শিশুমনে জাগ্রত ছিল বলিয়া তাহার কণ্ঠোদ্‌গীর্ণ অপরিস্ফুট অত্যন্ত অগোছালো অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন শব্দসমূহক গুছাইয়া ভাষার গণ্ডীতে আনিয়াছিল, তাহা অন্ধকার অতীতের কাল হইতে অদ্যাবধি মানুষের মনে নিয়ত জাগরূপ থাকিয়া তাহার ভাষাবন্ধনকে দৃঢ় রাখিয়াছে সেই সম্যবোধই ভাষাশক্তির একটা মূল উৎস। একই শ্রেণীর ভিন্নাকার বিবিধ পদকে এক ছাঁচে ঢালিবার প্রচেষ্টার ফলেই সকল উন্নতিশীল ভাষার ব্যাকরণ সরল হইতে সরলতর হইয়া চলিয়াছে।

একাধিক ভিন্নাকার শব্দ যদি অন্য শব্দের আকার পায় তবে সেই ব্যাপারকে বলে সাদৃশ্য (Analogy) । কখনো কখনো ইহারই প্রভাবে অনেক শব্দ সুনির্দিষ্ট ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম এড়াইয়া যায়। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি।

সংস্কৃত শব্দমধ্যস্থিত যুক্ত (conjunct) ব্যঞ্জনধ্বনি প্রাকৃতে যুগ্ম (double) ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং প্রাকৃতের এই যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি আবার বাঙ্গালায় একটিমাত্র ব্যঞ্জনে পরিণত হইল, আর এই ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ হইল। যেমন, সং কর্ম > প্রা কম্ম > বা কাম, নিদ্রা > নীদ, পশ্চা (ৎ) > পচ্ছ > পাছ, ভক্ত > ভত্ত > ভাত, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ, ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত 'সর্ব' হইতে প্রাকৃতে 'সব্ব' হইল বটে, কিন্তু তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'সাব' না হইয়া 'সব' হয় কেন? এখানে তো সূত্রের ব্যতিক্রম হইল। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, সম্ভবত এখানে 'সভা' শব্দের প্রভাব পড়িয়াছে, তাই, 'সাব' না হইয়া 'সব' হইয়াছে। যে সময়ে প্রাকৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয়, সে সময়ে বহুত্বজ্ঞাপক 'সভা' শব্দের প্রচলন ছিল, এখন যেমন আমরা বহুবচনে 'গণ, সমূহ, সমাজ, সম্প্রদায়' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরকম।।"

[ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন]

নাপতিনি, ধোপানি ইত্যাদি ব্যবসায়গত স্ত্রীত্ববোধক কয়েকটি শব্দ মনে থাকলেই প্রয়োজনমতো সেগুলির সাদৃশ্যে মাস্টারনি, মজুরানি ইত্যাদি শব্দ তৈরি সম্ভব হয়।

সংস্কৃতে বধূটি শব্দ থেকে বাংলা 'বউড়ি' শব্দের উদ্ভব। পরে এই শব্দের সাদৃশ্যে 'শাশুড়ি' এবং 'ঝিউড়ি' শব্দ তৈরি হয়েছে। সংস্কৃতে দেবতা, বন্ধুতা ইত্যাদি [-তা] প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'ভাব' অর্থ জ্ঞাপন করে। এই সমস্ত শব্দের সাদৃশ্যে 'মম' (= আমার) ভাব' অর্থাৎ 'আত্মপরতা' অর্থে মমতা শব্দের উদ্ভব হয়েছে।

বাংলায় বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ 'টাকার কুমীর' -এর 'কুমীর' শব্দটি এসেছে ধন সঞ্চয়ের দেবতা 'কুবের' থেকে। সুতরাং বাংলায় পদগুচ্ছটি হওয়া উচিত ছিল 'টাকার কুবের' বা 'টাকার 'কুবীর'। এখানে 'কুবীর শব্দটি 'কুমীর' শব্দের সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। 'হাঁস' ও 'পাতাল' এই দুটি শব্দের সাদৃশ্যে ইংরেজি শব্দ 'হস্‌পিট্যাল (Hospital) বাংলায় হয়েছে 'হাঁসপাতাল'। পুরনো বাংলায় ষষ্ঠীর বহুবচনে 'আম্মার', 'তোম্মার' পদ দুটির সাদৃশ্যে 'সবার' শব্দের বিকল্পরূপ গড়ে উঠিছিল 'সম্ভার'।

নতুন শব্দের সৃষ্টিতে যেমন, পুরাতন শব্দের অর্থ পরিবর্তনেও তেমনি, সাদৃশ্য বিশেষ কার্যকর। 'অন্তরিক্ষ'-বাচক বৈদিক 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

বিমিশ্রণ :

বহু শব্দের সাদৃশ্যে না হয়ে যদি একটি মাত্র শব্দের প্রভাবে অপর কোনো শব্দের রূপ পালটে যায় তবে তাকে বিমিশ্রণ বলে। যেমন- পুর্তগিজ আনানস 'রস'-এর প্রভাবে বাংলায় আনারস হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'তড়িৎ' শব্দের প্রভাবে 'ঝটিৎ' শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন। অনেক সময় বিমিশ্রণের ফলে ভুল বানানের সৃষ্টি হয়। যেমন-

'কালিদাস'-এর সাদৃশ্যে লিখিত হয় 'কালিপ্রসন্ন', 'চণ্ডিদাস' ইত্যাদি।

জোড়কলম শব্দ :

দুটি শব্দ কাটাজোড়া করে একটি নতুন শব্দ তৈরি হলে তাকে জোড়কলম শব্দ বলে। যেমন - আরবি মিন্নৎ +সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি (>প্রাকৃত বিন্নত্তি)>বাংলা মিনতি। নিশ্চল+চুপ>নিশ্চুপ; জেদি+তেজালো>জেদালো; পৃথু+স্থল >পৃথুল; পয়োধর+ভার=পয়োভার ইত্যাদি।

বিশ্রিণ ও জোড়কলমের মধ্যে গঠন প্রক্রিয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য আছে, পার্থক্য শুধু অর্থগত। বিমিশ্রণে যে দুটি শব্দের যোগ হয় সেই শব্দ দুটির অর্থ প্রায় একই রকম নয় বা শব্দ দুটি সমান গুরুত্বপূর্ণও নয়। কিন্তু জোড়কলম শব্দে যে দুটি শব্দ যুক্ত হয় সেই শব্দ দুটির অর্থ প্রায় একই রকম এবং শব্দ দুটি প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সংকর শব্দ :

বিভিন্ন ভাষা অথবা একই ভাষার বিভিন্ন শব্দ বা প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি শব্দাংশ মিলিত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে সংকর শব্দ বলে। যেমন - ইং. মাস্টার+বাং. [-ই] প্রত্যয়=মাস্টারি; বাং. [নি-] উপসর্গ +ফারসি খরচা=নিখরচা; বাং. √কহ্+সং. [-তব্য] প্রত্যয়=কহতব্য ইত্যাদি।

লোকনিরুক্তি :

অনেক সময় দেখা যায় অপরিচিত শব্দ অল্পবিস্তর ধ্বনিসাম্যের সুযোগে পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য লাভ করে। এইরূপ শব্দবিকৃতিকে লোকনিরুক্তি বলে। যেমন - প্রাচীন বৈদিকে মাকড়শার নাম ছিল ঊর্ণবাভ অর্থাৎ 'যে কীট ঊর্ণা বয়ন করে'; পরে বয়নার্থক 'বভ' ধাতু অপ্রচলিত হওয়ায় এবং মাকড়শা ভূতাতন্তুর মাঝখানে অর্থাৎ নাভীদেশে থাকে বলে নাভীসাদৃশ্যে শব্দটি 'ঊর্ণনাভ'তে রূপান্তরিত হয়েছে। ইং. আর্মচেয়ার বাংলায় 'আরাম কেদারা' হয়ে গেছে, কেননা এই চেয়ারে বসা আরামের। 'টাকার কুমীর'-এর কুমীর শব্দটি এসেছে 'কুবের' শব্দ থেকে (কুবের>কুবীর>কুমীর)। 'বিষ'-এর প্রভাবে সংস্কৃত 'বিস্ফোটক' বাংলা 'বিষফোঁড়া'য় পরিণত হয়েছে।

বিষমচ্ছেদ বা নিষ্কাসন :

সাদৃশ্যের প্রভাবে অথবা শব্দের বিশ্লেষণ — বিকৃতির ফলে কখনো কখনো শব্দের রূপ পরিবর্তন হয়, অথবা নতুন প্রত্যয়ের কিংবা নতুন শব্দেরও এভাবে উদ্ভব হয়। এরূপ শব্দবিকারের নাম বিষমচ্ছেদ বা নিষ্কাসন। যেমন - সংস্কৃত 'নবরঙ্গ' ফারসিতে 'নারাঙ্গ' হয়েছে। আবার নারাঙ্গ থেকে আরবি 'নারাঞ্জ', তা থেকে ইংরেজিতে an orange (একটি কমলালেবু) হয়েছে। এভাবে norange শব্দ দাড়ল orange এ। 'অসুর' শব্দটি মৌলিক। এর প্রথম অক্ষরকে না-বোধক, উপসর্গ ভেবে বিষমচ্ছেদের ফলে দেবতা অর্থে সুর শব্দের উদ্ভব। এইভাবে বিধবা মৌলিক শব্দ থেকে 'পতি' অর্থবাচক 'ধব' শব্দের উৎপত্তি। ভ্রম বশত সম্বন্ধবিভক্তি মনে করায় শেষের র-কার ত্যাগ করে ফারর্সি 'মুহরির', 'বর্গির' বাংলায় হয়েছে 'মুহুরি', 'বর্গি'। 'সদৃশ' থেকে উৎপন্ন 'সরেস' বিষমচ্ছিন্ন হয়ে বিপরীতার্থক 'নিরেশ' শব্দ উৎপন্ন করেছে। 'অট্টহাস', 'অট্টহাস্য' ইত্যাদি থেকে নিষ্কাসন করে রবীন্দ্রনাথ 'অট্ট' শব্দটি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন - 'অট্ট গরজে', 'অট্ট হাসিয়া', 'অট্ট বিদ্রুপ' ইত্যাদি। বাংলা মন, মতো, হেন শব্দগুলি বিষমচ্ছেদের ফলে উৎপন্ন।

ভূয়াশব্দ :

লোকনিরুক্তির বশে অথবা অন্য কারণে অনেক সময় শব্দের একটা কল্পিত মূল উপাদান দাঁড় করিয়ে তার সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি যোগ করে এমন শব্দ গঠন করা হয় যার বাস্তবিক কোনো মূলই নেই। এমন শব্দকে বলা হয় ভূয়াশব্দ। যেমন - সাধুভাষার 'প্রোথিত' শব্দটি। সংস্কৃতে কোনো 'প্রোথ' ধাতু নেই। শব্দটি বাংলা 'পোঁতা' শব্দের পূর্বরূপ প্রাকৃত শব্দের আধারে কল্পিত। সংস্কৃত নীরাজন (প্রাচীন কালে আশ্বিন অথবা কার্তিক মাসে যুদ্ধ যাত্রার আগে রাজারা অস্ত্র-শস্ত্র এবং হাতি-ঘোড়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে জলাভিষিক্ত করতেন, সেই অনুষ্ঠান, নীরমজ্জন)>প্রাকৃত *নীরঁজ্জন সাধুভাষায় 'নিরঞ্জন'।

সম্মুখ-ধ্বনিপরিবর্তন :

ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে যদি একাধিক শব্দ পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণ ও বানানে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করে তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন বলে। যেমন - সংস্কৃত পততি >বাং. পড়ে (falls), সং. পঠতি >পড়ে (reads)। এখানে 'পততি' এবং 'পঠতি' শব্দদুটি ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করেছে। তেমনি সখী >সই, সহি (সহ্য করি) >সই; ব্যাকুল >বাউল, বাতুল >বাউল।

সমরূপশব্দ :

বিভিন্ন শব্দ সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে যদি একই রূপ লাভ করে তবে তাকে বলা হয় সমরূপ শব্দ। যেমন - বোনা = বয়ন ও বপন (কাপড় বোনা, ধান বোনাগ্ন, বাউল = বাতুল ও ব্যাকুল; ডাল = ভোজ্যবিশেষ এবং বৃক্ষের শাখা; বই = পুস্তক; ব্যতীত এবং বহন করি ইত্যাদি।

সমধ্বনিশব্দ :

বিভিন্ন শব্দ ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে যদি একই ধ্বনিরূপ লাভ করে অথচ বানানে

পৃথক থাকে, তবে তাদের সমধ্বনি বলা হয়। যেমন— সং. সুবর্ণ >বাং. সোনা, শ্রবণ >শোনা; বাং. শান, সান<সং. শাণ, সংজ্ঞা ইত্যাদি।

বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন :

একই শব্দ যদি ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক রূপ লাভ করে অর্থাৎ ধ্বনির পরিবর্তনের ফলে যদি একই শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন বলে। যেমন— ভণ্ড >ভান ও ভাঁর, চিত্র >চিতা ও চিত্তির, শ্রদ্ধা >সাধ ও ছেদ্দা, ঘটিকা >ঘড়ি ও ঘটি, চক্র >চরকা, চাকা ইত্যাদি।

অনুকার শব্দ :

সমাসের মতো দেখতে কোনো কোনো শব্দের দ্বিতীয়াংশ প্রথম অংশেরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ, অনেকটা প্রতিধ্বনির মতো। এরূপ শব্দকে অনুকার শব্দ বলে। যেমন— বইটই, ভাতটাত, চাকরবাকর, গানফান ইত্যাদি।

অনুগামী শব্দ :

অনুকার শব্দের মতো কোনো কোনো শব্দ দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বিতীয় অংশরূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ শব্দকে অনুগামী শব্দ বলে। যেমন— রাজারনুজরা, পাখিপাখালি, ছেলেপিলে ইত্যাদি।

সমার্থক অনুগামী শব্দ :

দুটি সমার্থক শব্দ যদি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়, আবার যদি দ্বিতীয় পদটির স্বাধীন ব্যবহারও স্বীকৃত থাকে তবে তেমন শব্দকে বলে সমার্থক অনুগামী শব্দ। যেমন— কুলিকামিন, ধারেকাছে, গাছপালা, দাবিদাওয়া ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ :

শব্দের উচ্চারণে অর্থের সঙ্গে সঙ্গে কোনো বাহ্য বস্তুর ধ্বনিও ঝংকৃত হলে তাকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট। যেমন— ঝড় ঝড়, ক্যাটক্যাট, মটমট, ঝিরঝির, খুটখুট ইত্যাদি।

কোনো কোনো ধ্বন্যাত্মক শব্দ পুরোপুরি ধ্বন্যাত্মক নয়, কোনো সাধারণ শব্দগর্ভ। যেমন মিশমিশে (কালো), এখানে 'মিশি' শব্দটি লুকিয়ে আছে। ধবধবে (সাদা), এখানে ধোয়া (বা ধোবা) শব্দ রয়েছে। গনগনে (আগুন), এখানে আগুন শব্দের রেশ আছে।

মুণ্ডমাল শব্দ :

বাক্যাংশের আদিধ্বনির সমাহারে যেসব শব্দ সৃষ্টি তাকে মুণ্ডমাল শব্দ বলে। যেমন ইং Rader (= Radio Detection And Ranging); Unesco (= United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) বাংলায় উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দুই কুঁড়ের সংলাপ পিপুফিশু।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের কাজ কী? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

বিমিশ্রণ এবং জোড়কলম শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক কতটুকু? (৩০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

লোকনিরুক্তি ও বিষমচ্ছেদের পার্থক্য কী? (৪০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

ধ্বনিপরিবর্তনের প্রকৃতিসমূহ উল্লেখ করে এর প্রধান প্রধান ধারাগুলির পরিচয় দিন।

[সংকেতসূত্র: প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৬.৩ ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি

বাংলায় ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনির ধ্বনি-পরিণতি কোথায়, কীভাবে এবং কীরূপ হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান সম্পদ তদ্ভব শব্দাবলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে মধ্যভারতীয় আর্যের বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এই শব্দগুলোর বিবর্তনের ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শব্দস্থিত প্রাচীন ভারতীয় আর্যের স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো বিপুল পরিমাণে বিবর্তিত হয়ে বাংলায় বর্তমান রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। শব্দস্থিত প্রাচীন ভারতীয় আর্যের স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিবর্তনে রূপরেখাটিকে বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যথাক্রমে "প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনি বাংলায় বিবর্তনের ধারা (Treatment of OIA vowels in Bengali) এবং "প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যঞ্জন ধ্বনির বাংলায় রূপান্তরের ধারা" (Treatment of OIA vowels in Bengali) দুটি পর্যায় ভেদে আলোচনা করা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের স্বরধ্বনির বাংলায় বিবর্তনের ধারাটিকে আবার স্বরধ্বনির অবস্থান-অনুসারে আদি স্বরধ্বনি, মধ্যস্বরধ্বনি এবং অন্ত্যস্বরধ্বনির প্রকার ভেদে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। ইংরাজিতে এই পর্যায়গুলোকে বলা হয় (Treatment of OIA initial, medial and Final vowels in Bengali), শব্দস্থিত মধ্য স্বরধ্বনির রূপান্তরকে 'ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি' (vowels not in contact) এবং 'সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি' (vowels not in contact) নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে আদি, মধ্য ও অন্ত্য ব্যঞ্জন নামে তিনটি উপবিভাগে সমগ্র আলোচনাটিকে বিন্যস্ত করা হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্রে এই তিনটি উপবিভাগেও আবার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্বর এবং ব্যঞ্জন ধ্বনির বাংলায় রূপান্তরের রূপরেখাটিকে একটি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে —

বাংলা ধ্বনিমালার ইতিহাস
(History of Bengali Sounds)
বা
প্রাচীন ভারতীয় আর্যের স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বাংলার বিবর্তনের ধারা
(Treatment of OIA vowels sound consonants in Bengali)

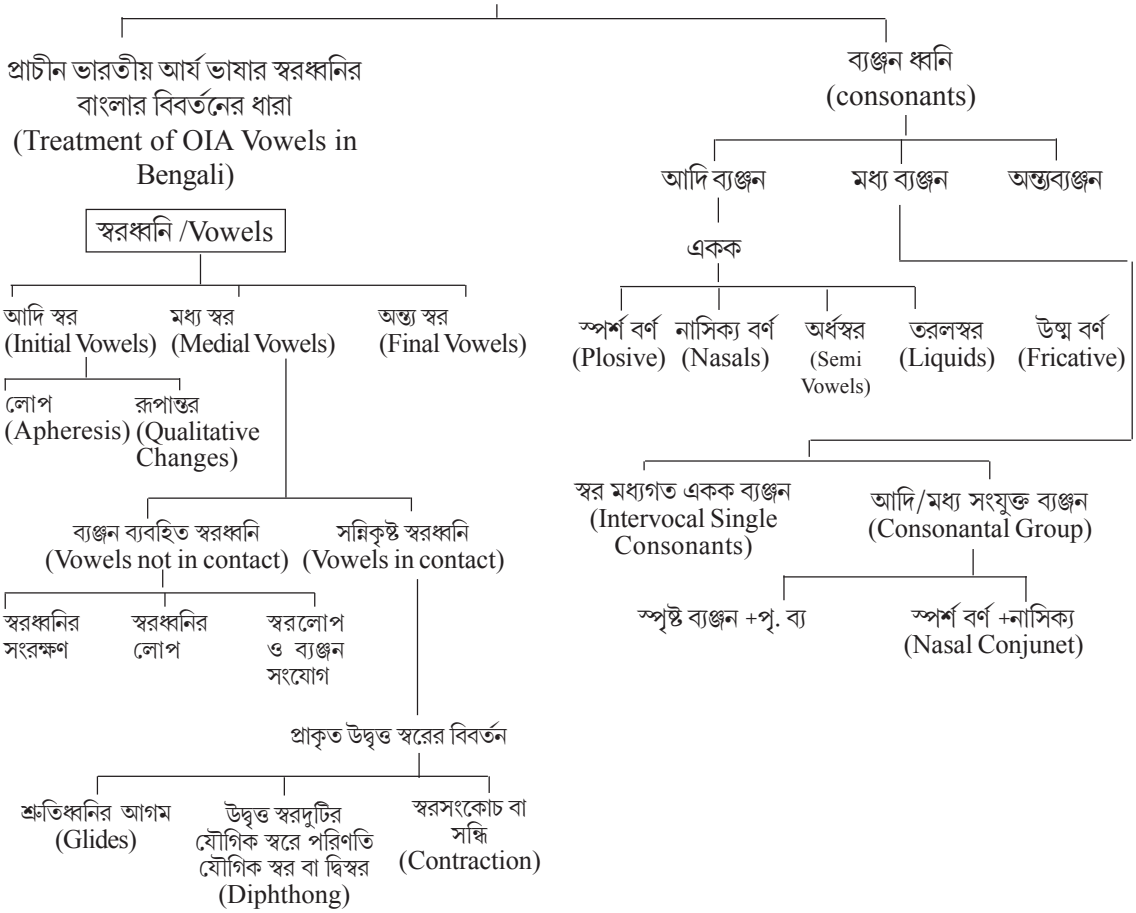

ড° সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্তে' অবশ্যে 'ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি' বা 'সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি'র আলোচনায় কোনো উপবিভাগ না-রেখে সামগ্রিকভাবে সাতটি নিয়মের সূত্রে বাংলায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যের স্বরধ্বনির বিবর্তনের রূপরেখাটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

(১) সংস্কৃত ও প্রাকৃত পদের আদিতে এবং পদের মধ্যে অবস্থিত স্বরধ্বনি যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বে থাকলে বাংলায় দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়। যেমন পদের আদিস্থিত স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে — সং- অষ্ট > প্রা. অট্ঠ > বাং আট, সং, চন্দ্র > চন্দ > চান্দ> চাঁদ, ইত্যাদি। এবং পদের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে —

বন্ধ্যা> বঞ্ঝা > বাঁঝা, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ ইত্যাদি

(২) কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ও লক্ষ করা যায়। সে-সব ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী অ-কার আ-কারে পরিণত হয় না। যেমন- বর্ততে > বট্টই > বটে, সর্ব > সব্ব > সব ('সভা' শব্দের প্রভাবে) সপ্তদশ > সত্তরহ > সতেরো; পঞ্চদশ > পন্নরহ > পনেরো ইত্যাদি (এই উদাহরণগুলোতে অ-কার দীর্ঘ)

(৩) পদের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের অভাবের জন্য স্বরধ্বনি বাংলায় লুপ্ত হয়। যেমন অভ্যন্তর > ভিতর, অরিস্ট > অরিট্ট > রীঠা, রিঠা, উপবিশতি > উপবিসই > বইসই > বসে, অহকম্ (অহম্ স্থলে> প্রা. হক্ং) প্রা.বা ইউ, স. উদ্ধার > উদ্ধার > ম.বা. উধার > আ.বা. ধার

(৪) সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি প্রাচীন বাংলায় 'অ'-তে রূপান্তরিত হয়ে পরে লুপ্ত হয়েছ। যেমন, সং ভক্ত > প্রা.ভত্ত > বাং ভাত > ভাৎ; সং রাজা > প্রা. রাজা > রায়া, বাং রায়; সং যুক্তি > প্রা. জুত্তি > যুত > যুৎ, সং দদ্রু> প্রা. দদ্দু> বা দাদ্, সং পুত্রঃ> পুত্তো> পুত> পুৎ, সং বাহু> প্রা.বাহু> প্রা.বা.ম.বা. বাহ

(৫) প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনি আধুনিক বাংলার দ্ব্যক্ষর উচ্চারণপদ্ধতি অনুসারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লুপ্ত হয়েছে। যেমন- গামোছা> গাম্ছা, রাধনা> রান্না, আঁকুশি> আঁক্শি অ-পরাজিতা> অপরা-জিতা> অপরা-জিতা; অবসর> অবসর, অপসর। অঙ্কুশিকা> আঁকুশি> আঁকুশি, নামবাচক শব্দে মদন> মদ্না, বিপিন> বিপ্নে, ফটিকে> ফট্কে, গণেশ> গণ্শা

(৬) অপিনিহিতির ফলেও স্বরধ্বনির লোপ হয়েছে। যেমন. চারি> চাইর> চার, মাগু> মাউগ> মাগ

(৭) প্রাচীন বা আদি-মধ্য বাংলায় কখনো কখনো অ-কার> আ-কার অথবা আ-কার> অ-কার হয়েছে। যেমন—

অ-কার> আ-কার ঃ সং অপর-> প্রা. অবর-ম. বা আঅর> আর, সঃ অশীতি> প্র.অসীই-> আশী, সং অস্মে> প্রা.বা অন্তে, আন্তে

আ-কার> অ-কা ঃ সং প্রাকার-> বা. পগার

ড° সুকুমার সেন নির্দেশিত এই সাতটি নিয়ম ছাড়াও শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত প্রবণতার জন্য প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়েছে। যেমন-

অ ঃ কদম্ব > কদমা, চিত্রফল > চিতল, অর্গলয়তি > আগ্‌লায়,

আ ঃ অক্ষবাট > আখড়া, কুত্মান্ত > কুম্‌ড়া; গোপাল > গোয়াল > গয়লা, অঙ্গার > আঙ্গরা, আঙরা

ই, ঈ ঃ খনিত > খন্তা, পরীক্ষা > পরখ; প্রেতিনী > পেত্‌নী, পিপীলিকা > পিপঁড়া, প্রতিবেশিন্‌ > পড়শী

উ, ঊ ঃ লঘুক > হালকা, বিদ্যুৎ > বিজলী > বিজলী, বিজলি, অঙ্গুলিকা > আঁকুশি > আঁকশি > অঙ্গুষ্ঠ > আঙটি

এ ঃ সন্দেহ > সন্দ, প্রতিবেশী > পড়শী

ও ঃ গামোছা > গাম্‌ছা

তবে পদের অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনির উচ্চারণ বিবৃত হলে, পদমধ্যস্থিত স্বরধ্বনি লুপ্ত হয় না। যেমন—

অ ঃ বন্ধন> বাঁধন, অঞ্চল > আঁচল, পঞ্জর > পাঁজার, উজ্জ্বল > উজল।

আ ঃ শৃগান > শিয়াল, শ্মশান > মশান, সৌভাগ্য > সোহাগ, সন্তার > সাঁতার

উ, ঊ ঃ খর্জুর > খেজুর, সিন্ধুর> সিদুঁর, নিষ্ঠুর > নিঠুর

এ, ও ঃ রমেশ > রমেশ, কল্লোল > কল্লোল্‌, গণেশ > গণেশ্‌

ড° সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্তে' অবশ্য বাংলায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যের স্বরধ্বনির বিবর্তনের আলোচনায় কোনো উপবিভাগ না রেখে সাতটি নিয়মের সূত্রে ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি এবং ১৬ টি নিয়মের গণ্ডিতে সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির প্রসঙ্গ দুটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ড° সুকুমার সেনের মতে বাংলায় সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনিগুলো দুইভাবে সৃষ্ট হয়েছিল। প্রথমত দ্বিস্বরের বিশ্লেষণে, দ্বিতীয়ত প্রাকৃতস্তরে স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনধ্বনির লোপের ফলে। এরমধ্যে প্রথম প্রকারের উদাহরণ বাংলায় বেশি নাই। এই শ্রেণির অন্তর্গত শব্দগুলোতে প্রথমে দ্বিস্বরের বিশ্লেষণ সংঘটিত হয় এবং পরবর্তীতে অন্তর্সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন সং গৌর বাংলায় 'গউর' রূপে বিশ্লেষিত হয়ে পরে অন্তর্সন্ধির ফলে 'গোরা'রূপে বিবর্তিত হয়েছে। এধরনের আরো কয়েকটি উদাহরণ —

সং বৈদ্য- বা বইদ্দ > বোদ্দি;

সং-চৈত্র, > প্রা* চইত্ত > বা চোত (মাস)

সং বৈশাখ > বা. বোশেখ

সং ঔষধ > বা. ওষুধ

বাংলায় দ্বিতীয় প্রকার সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি প্রাকৃতস্তরের স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপের ফলে উৎপন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনলোপের ফলে স্বরধ্বনিগুলো পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে দ্বিস্বর, ত্রিস্বর ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এবং পরবর্তীতে অন্তর্সন্ধির ফলে বহুক্ষেত্রেই অন্যস্বরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বাংলায় এধরনের দ্বিস্বর ধ্বনির (monosyllabic) রূপান্তরিত নিস্বরূপ পদের অন্তে উৎপন্ন দ্বিস্বর

(১) অ + ই -/ উ = ঐ (অই), ঔ (অউ)। এর উদাহরণ-

(ক) স. সখী > প্রা.সহী > বা সই > সৈ; প্রা. কহি (কোথায়) > বা. কই > কৈ, সং প্রতিষ্ঠা > প্রা. পইট্ঠা > বা পইঠা > পৈঠা

(খ) অ + উ = ঔ (অউ)

স. বধূ > প্রা. বহূ > বা. বউ > বৌ; স. মুকুট -> প্রা. মউড্ -> মউড় > মৌড় স. চতুর্থ - > প্রা. চউট্ঠ > বা চউবা> চৌঠা

(২) প্রাকৃতের ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্তির ফলে উৎপন্ন দ্বিস্বর যদি পদান্তে অবস্থিত না হয়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেষাং শের (-ই, -উ পরিত্যক্ত হয়ে অ-কারে নয়তো অন্যান্য স্থানে সন্ধিবদ্ধ হয়ে ও-কারে পরিণত হয়। যেমন-

সং সকুল > প্রা সউল > বা শৌল > শোল; সং- মুকুল > প্রা. মউল-> বউল > বা. বৌল > বোল; সং উপবিশতি > প্রা. বইসই > বা বৈসে > বসে; সং গমন > প্রা গবঁণ > প্রা. বা গউন> ম-বা. গোন, গন (=পথ)

(৩) অ + ই = এ > ই এবং অ + উ = উ, এর উদাহরণ

(ক) সং গত + ইল > অপ.* গঅইল্ল > গইল > গেল

সং অস্মাভিঃ > অম্হাহি > অম্হই > অম্হে > আমি

(খ) চলতু > চলউ > চলু; রাজপুত্র > রাঅউও > রাউত

তবে একাক্ষর (Monosyllabic) শব্দের এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন-

সং কবয়ী > প্রা. কঅই > বা. কই > কৈ (মাছ)

সং দধি > বা. দৈ; সং-বধূ > বউ > বৌ; সখী > সহী > সই > সৈ।

(৪) আ + ই (উ)-এর রূপান্তরে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি প্রাধান্য পেলে আ-কার অ-কার হয় এবং প্রথম স্বরধ্বনিটি প্রাধান্য পেলে ই (উ) = কার ক্ষীণ হয়ে লুপ্ত হয়। যেমন

(ক) সং আয়াত + ইল্ > প্রা. আইঅ-ইল> বা. আইল > এল

সং আকুল -> প্রা. আউল> বা আউল > আইলা > এলো

সং অবিধবা > প্রা. অবিহবা, > বা আইহ > এয়ো

সং অবিশতি > প্রা. আইসই > আইসে > আসে

(খ) সং > প্রা. আমিষ > আবিঁস > আমিষ আঁইষ > আঁষ

(৫) পদের অন্তে অবস্থিত 'আই' অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, সং-গাবী > বা গাই।

সং নাসীৎ > প্রা. নাসী > নাহী, বা নাই

সং আয়ু > আউ > আই; > বায়ু > বাউ > বাই

সং অলাবু > প্রা. অলাবু > বা লাউ।

(৬) পদান্তে অ + ই = এ-কারে হয়েছে। যেমন, অপ. করই > বা. করে।

কিন্তু পদান্তে আ + ই = য়- কার হয়েছে। তেমন, অপ. যাই > বা, যায়; অপ. গাই > বা গায়,

(৭) অ + অ = অ, কিন্তু পদান্তে অ + অ = আ, যেমন, সং শত > বা. শ,

কিন্তু সং কদলক- > প্রা. কঅলঅ > বা কলা; সং কর্পদক > প্রা. কবডঅ- > বা. কড়া, সং খাদতি > প্রা. খাঅই > বা খাই > খায়; সং রক্ষপাল > প্রা. রক্খবাল> ম.বা রাখআল > বা. রাখাল।

(৮) ই + (ঈ) + অ = ই (ঈ), যেমন, সং চলিত > প্রা. চলিঅ > বা চলী (চলি), সং পীতল - > প্রা. পীঅল - > পীলা (রং)ঃ সং জামাতৃক - > প্রা. জামাইঅ > বা জামাই

(৯) ই (ঈ) + ই (ঈ) = ই (ঈ), যেমন, সং জীবিত + ইল্ > প্রা জীবিঅইল্ল > জীইল্ল) ম.বা. জীল (জিল) = জীবিত, জীবিত হল।

(১০) ঊ (উ) + অ = উ (ঊ) যেমন, সং সুগন্ধিক -> প্রা. সুঅন্ধিঅ > ম. বা. সুন্ধি > আ. বা. সুঁদি সং প্র. গোরূপ -> গোরূব > বা গোরু

(১১) উ (ঊ) + ই (ঈ) মিলিত হয় নাই। যেমন, সং ভৃতি > বা, হুই (পদবী) সং পুতিকা > প্রা. পুইঅ > বা. পুই (শাক) সং সুতক > প্রা.* সুপিতক > প্রা. সুই অঅ > ম.বা, শুইয়া > আ.বা শুয়ে।

(১২) ঊ (উ) + ঊ (উ) = উউ, যেমন, সং দ্বাগুণক-> প্রা. দুউনঅ -> বা দুনা।

(১৩) এ + অ = এ, যেমন, দেবকুল-> প্রা. দেবউল -> দেঅউল-> বা দেউল। সং নেপুল ('নকুল' স্থানে) > প্রা.* বা নেউল; সং দয়থ প্রা. দেথ > দেহ > দেঅ > দে

(১৪) ও + আ = ও-কার, যেমন

সং যোগ -> প্রা. জোঅ

(১৫) পদের অন্তে ও + ই মিলিত হয় নাই। যেমন,

সং রোহিত (লোহিত) > প্রা. রোহিঅ > প্রা. বা লোহি > আ.বা. রুই (এউই) = লাল পিপড়া, উই পোকা।

(১৬) ও + উ = ও, যেমন,

সং গোধূম > প্রা. গোহুম > গোউম, > বা. গোম> গম (সম্ভবত কম শব্দের প্রভাবে)

এছাড়া প্রাকৃত স্তরে পদমধ্যবর্তী একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনির অবলুপ্তির ফলে বহু উদ্বৃত্তস্বরধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করত। পরবর্তীকালে, বিশেষত আধুনিক বাংলা পর্বে য়-শ্রুতি (য়, হ) এবং ব-শ্রুতি (ও, য়) সৃষ্টি হয়ে সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনিগুলোকে অন্তরিত করেছে। যেমন

য়-শ্রুতি সং সাগর > প্রা. সাঅর > বা. সায়র > সায়ের; সং কেতক্ > প্রা. কেঅঅ > বা. কেয়া

সং শিখর > প্রা. শিহর > বা শিয়র; সং মোদক > প্রা. মোঅঅ> বা মোয়া

সং হৃদয় > হিঅঅ > হিয়া; সং লোমন্, লোমক > বা রোঁয়া

ব-শ্রুতি ঃ সং কেতকট্ > বা কেওড়া

৬.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আমরা ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি যে, ভাষা পরিবর্তনশীল, ভাষার এই পরিবর্তন মূলত ধ্বনিপরিবর্তন। ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন কয়েকটি নির্দিষ্ট সূত্র অনুসরণ করে সাধিত হয়। তবে ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্রসমূহ আইনের মতো অলঙ্ঘ্য নয়, সম্প্রদায় বিশেষের উচ্চারণ রীতিরই সাময়িক প্রকৃতির নিদর্শন ধ্বনিপরিবর্তনে ধরা পড়ে। তাই এর ব্যতিক্রমও হয়েছে।

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এর প্রধান দুটি কারণ — বাহ্যকারণ ও আভ্যন্তরিণ — এই দুটি কারণকে চিহ্নিত করেছি। আভ্যন্তর কারণগুলোর দুটি স্থূল বিভাগ রয়েছে — একটি শারীরিক অন্যটি মানসিক। এই সমস্ত প্রধান কারণই আবার বিভিন্ন উপধারায় বিভক্ত। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রধান কারণসমূহের অন্তর্গত সূক্ষ্ম দিকগুলোকে চিহ্নিত করেছি।

ধ্বনিপরিবর্তনের প্রকৃতিসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে এর দুটি মূল ধারা কল্পনা করা যায় — একটি বিবর্তনমূলক ও সংযোগমূলক এবং অন্যটি মনোবিষয়ক। আমরা এইদুটি প্রধান ধারার অন্তর্গত ধ্বনিপরিবর্তনের সমস্ত সূত্রসমূহ আলোচনা করেছি। এছাড়া এই বিভাগের শেষে ব্যঞ্জনব্যবহিত স্বরধ্বনি আলোচিত হয়েছে।

৬.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। সমীভবন কী? নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির বিবর্তনে এই সমীভবনের ভূমিকা কীরূপ ব্যাখ্যা কারুন।

২। শব্দসাংকর্ষ এবং জোড়কলম বন্ধন কীভাবে নতুন শব্দগঠনে সহায়ক হয়?

৩। সাদৃশ্য কীভাবে নতুন শব্দগঠনে সহযোগিতা করে বুঝিয়ে দিন।

৪। সমীভবন কী? কত প্রকার সমীভবন আছে? এই সব সমীভবনের সঙ্গে বাংলা ভাষার কী সম্বন্ধ আছে ব্যাখ্যা করে দেখান।

৫। ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। টীকা লিখুন

অভিশ্রুতি, লোকনিরুক্তি, সাদৃশ্য, স্বরলোপ, স্বরসংগতি, প্রগত সমীভবন, স্বরভক্তি, নাসিক্যীভবন, ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন, অপিনিহিতি, বিপ্রকর্ষ, ব্যঞ্জনলোপ।

৬.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৭
কারক ও বিভক্তি, কারক বাচক অনুসর্গ

বিষয় বিন্যাস

৭.০ ভূমিকা (Introduction)

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৭.২ কারক ও বিভক্তি

৭.৩ কারক পরিচয়

- ৭.৩.১ কর্তৃকারক
- ৭.৩.২ কর্ম-কারক
- ৭.৩.৩ করণ-কারক
- ৭.৩.৪ সম্বন্ধ

৭.৪ কারক বাচক অনুসর্গ

৭.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৭.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৭.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৭.০ ভূমিকা (**Introduction**)

বাক্যে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে ক্রিয়াপদের যে অন্বয় বা পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে বলে কারক। বিভক্তি হল ধ্বনিসমষ্টি বা পদের অংশ, যার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা প্রয়োগ নেই, এগুলি পদের সঙ্গে বসে কারককে সূচিত করে মাত্র। একই বিভক্তির দ্বারা বিভিন্ন কারকের অর্থ প্রকাশ হলেও বলা যায় বিশেষ কারকের জন্য বিশেষ বিভক্তি নির্দিষ্ট, অথবা বিশেষ বিশেষ কারকের চিহ্ন বিশেষ বিশেষ বিভক্তি। সংস্কৃতে সম্বোধন ছাড়া কারক ৭টি — কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ— এই সাতটি কারকের সাতটি বিভক্তি কেবল একবচনে অ-কারান্ত শব্দেই দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে মধ্য ভারতীয় আর্যে কারকের সংখ্যা কমে গেছে, অপভ্রষ্টে কারকের সংখ্যা তিনটি। বিভক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে আধুনিক বাংলায় কারক চারটি— কর্তা, কর্ম, করণ-অধিকরণ এবং সম্বন্ধ। এই চারটি কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তন, উৎপত্তির ইতিহাস এবং প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখন আলোচনা করব।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"বাংলায় 'কারক' শব্দটি সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইংরেজি 'Case' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় এখন 'কারক' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। অথচ সংস্কৃত ব্যাকরণের 'কারক' এবং ইংরেজি ব্যাকরণের 'Case'-র তাৎপর্য ঠিক এক নয়। পাণিনির মতে 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্'— ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক থাকে তা-ই হল কারক। এই সম্পর্কের প্রকারভেদ অনুসারে সংস্কৃতে কারক হল— কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক। কিন্তু ইংরেজি মতে শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে নয়, বাক্যের অন্তর্গত যে-কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক থাকে তাকেই Case বলে। এই সম্পর্কের প্রকৃতি অনুসারে Case আট রকম— Nominative (কর্তৃকারক), Accusarative (কর্মকারক), Instrumental (করণকারক), Dative (সম্প্রদান কারক), Ablative (অপাদান কারক), Genitive or Possessive (সম্বন্ধ পদ), Locative এবং Vocative (সম্বোধন পদ)। সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে পাশ্চাত্য মতে Genitive ও Vocative-কে কারক বলা হয়, কিন্তু সংস্কৃত মতে এগুলি কারক নয়, এগুলিকে বলা যায় যথাক্রমে সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ। কারণ এদের সঙ্গে ক্রিয়ার সোজাসুজি কোনো সম্পর্ক থাকে না, অথচ সংস্কৃত মতে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কই হল কারকের মূল কথা। যেমন— রামের ভাই লক্ষ্মণ পঞ্চবটী বনে সীতাকে রক্ষা করার জন্যে থেকে গেলেন। এখানে ক্রিয়া হল 'থেকে গেলেন'। এই বাক্যে 'থেকে যাওয়া'র কাজটি রাম করেননি, লক্ষ্মণই করেছিলেন। সুতরাং এই বাক্যের 'রামের' শব্দের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধ নেই, তাই সংস্কৃত মতে 'রামের' শব্দটি কারক নয়, সম্বন্ধ পদ। অন্যদিকে 'রামের ভাই' এই পদগুচ্ছে 'রামের' সঙ্গে 'ভাই' শব্দের সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক হল সম্বন্ধের সম্পর্ক। ইংরেজি সংজ্ঞা অনুসারে এটাও কারক। যাই হোক ইংরেজির সঙ্গে সংস্কৃতের এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণত ইংরেজি 'Case' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'কারক' শব্দই এখন প্রচলিত। এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্বে কারক শব্দ Case শব্দের প্রতিশব্দ রূপেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়।"

[সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা : রামেশ্বর শ]

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

কারক কাকে বলে? (২৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

সংস্কৃত ও বাংলাতে কারকের ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায়? (৭৫টি শব্দের মধ্যে)
.....
.....

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বক্ষ্যমাণ বিভাগে আমরা বাংলা কারক ও বিভক্তি এবং কারক বাচক অনুসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চলেছি। এই অধ্যায়ের আলোচনা সমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যাতে—

- আপনারা সংস্কৃত ও বাংলা কারকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলা কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তন তথা উৎপত্তির ইতিহাসকে অনুসরণ করতে পারবেন।
- বিভক্তিগুলির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- কারকবাচক অনুসর্গের আলোচনার মাধ্যমে আপনারা অনুসর্গের প্রকার ভেদ ও ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৭.২ কারক ও বিভক্তি

বাক্য মধ্যে অবস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যপদের (নামপদের— বিশেষ্য ও সর্বনাম) 'অন্বয়' বা পারস্পরিক সম্পর্ককে 'কারক' (case) বলা হয়। বাক্যমধ্যে কিছু কারকসূচক ধ্বনি সমষ্টি বা পদাংশ যুক্ত হয়ে কারকটি সুস্পষ্ট করে তোলে। এই ধ্বনিসমষ্টি বা পদাংশকে 'বিভক্তি' বলা হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্বোধন পদকে বাদ দিলে সাতটি কারকের সন্ধান পাওয়া যায়- কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপদান, অধিকরণ এবং সম্বন্ধ। এই সাতটি কারকের সাতটি বিভক্তি কেবল মাত্র অ-কারান্ত শব্দের একবচনই লক্ষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্যস্থানে বিভক্তি ছয়টি। সংস্কৃতে দ্বি-বচনে বিভক্তি চিহ্ন তিনটি, বহুবচনে ছয়টি।

মধ্যভারতীয় আর্যের স্তরে প্রাকৃত ভাষায় এই বিভক্তির সংখ্যা কমে চার-পাঁচটিতে এসে দাঁড়ায়। অপভ্রষ্ট পর্যায়ে তা আরো কমে হয় তিনটি। বিভক্তি দিক থেকে পর্যালোচনা করলে প্রাচীন বাংলায় কারকের সংখ্যা ছিল তিনটি — (১) কর্তা-কর্ম, (২) করণ-অধিকরণ এবং (৩) সম্বন্ধ। এছাড়াও কয়েকটি গৌণ-কর্ম এবং অপাদান কারকের প্রাচীন পদের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সেগুলোর সংখ্যা এবং ব্যবহার ছিল নিতান্তই অল্প।

আধুনিক বাংলায়ও বিভক্তির দিক থেকে বিচার করলে মোট চারটি কারকের সন্ধান পাওয়া যায়। এবং সেগুলো হল — (১) কর্তা, (২) কর্ম, (৩) করণ-অধিকরণ এবং (৪) সম্বন্ধ। আধুনিক বাংলার কারক এবং কারক বিভক্তিগুলো একটি তালিকায় প্রকাশ করা হল—

কারক	**বিভক্তি**
কর্তৃকারক	শূণ্যবিভক্তি, -এ (-য়ে, -য়), -তে, -এতে
কর্ম ও সম্প্রদান কারক	-এ (-য়ে, -য়), -ক, -কে, -রে (-এরে)
করণ ও অধিকরণ কারক	-এ (-য়ে, -য়), -ত, -তে (-এতে)
সম্বন্ধ	-র, -এর, কর

আধুনিক বাংলা ভাষায় বিভিন্ন কারকের বিভক্তি চিহ্নগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যের বিবর্তনের ফলে বর্তমানরূপ পরিগ্রহ করেছে। এই কারক বিভক্তিগুলোর বিবর্তনের ধারাটিকে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণর মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে।

কর্তৃ কারক

কর্তৃকারকের বিভক্তি চিহ্নগুলোর মধ্যে প্রথমেই এসে পড়ে শূন্য বিভক্তির প্রসঙ্গ। এই শূণ্য বিভক্তি হল প্রকৃত পক্ষে লুপ্ত বিভক্তি চিহ্ন। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষায় অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে কর্তার একবচনে বিভক্তি ছিল '-স' এটিকে প্রকাশ করা হত বিসর্গ (ঃ) দিয়ে। এই বিভক্তিটি প্রাকৃত ভাষার স্তরে হয় লুপ্ত, নয়তো প্রাচ্যায় [-এ] এবং অন্যত্র [-ও]-তে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই [-এ] বিভক্তিটি পরবর্তীকালে বাংলায় [-ই] রূপ পরিগ্রহ করে অবশেষে লুপ্ত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। যেমন, পুত্রঃ>পুত্তে* পুত্তি>পুত>পুৎ। তবে বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ড° সুকুমার সেন এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, "... এ অনুমানের সমর্থন প্রমাণ নাই। ই-কারান্ত কোন কর্তা পদ অপভ্রষ্টে বা প্রাচ্য অপভ্রংশে একবারও মিলে নাই। সুতবাং মধ্য-ভারতীয় আর্যে লুপ্ত '-স' বিভক্তির পদই যে অপভ্রংশ-অপভ্রষ্টের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে সিদ্ধান্ত অপরিহার্য বোধ হইতেছে।" ড° সেনের মতানুসারে আধুনিক বাংলার কর্তৃ কারকের শূন্য বিভক্তির বিবর্তন রেখাটি হল— পুত্র>পুত্ত>পুত>পুৎ।

অনির্দিষ্ট কর্তায় '-এ' বিভক্তির ব্যবহার আধুনিক বাংলা ভাষার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন, লোকে বলে, বাঘে খায়, 'তাকে শিয়ালে খাইয়াছে', 'পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়' ইত্যাদি। এই '-এ' বিভক্তিটির উৎস নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে স্বার্থিক অথবা ক্ষুদ্রত্ব বাচক [-ক] প্রত্যয়ের সঙ্গে কর্তার একবচনে প্রযুক্ত 'স' অর্থাৎ (ঃ) যুক্ত হয়ে [-কঃ] হয়। এই [-কঃ] প্রাচ্যা প্রাকৃতে [-কে] -তে পরিবর্তিত হয়ে। অর্বাচীন অপভ্রংশে [-ই] হয়েছিল। এই [-ই] শব্দের অন্ত্যস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলায়

হয়েছিল [-এ]। যেমন, পুত্রকঃ> পুত্তকে >*পুত্তএ>* পুত্তই > পুতে। সর্বকঃ>সব্বকে>* সব্বই >সবে। তবে এই যুক্তি ড° সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিত মেনে নেন নি। তাঁদের মতে এই ব্যাখ্যা জটিল এবং দূরান্বয় দোষে দুষ্ট। ড° সেন বাংলায় এই [-এ] বিভক্তির উৎস নির্দেশ করে বলেছেন, 'আসলে এমন পদ আসিয়াছে করণ কারক হইতে।' বস্তুত সংস্কৃতে অনুক্ত কর্তায় করণ বিভক্তি প্রযুক্ত হত। অপভ্রংশ যুগে কর্ম ও ভাব বাচ্যের ব্যবহার ছিল বেশি। সেখানে কর্তা অনুক্ত হয়ে তৃতীয়ান্ত হত। সেই সূত্রে সংস্কৃতের তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন 'এন' থেকে বাংলায় কর্তৃকারকে '-এ' বিভক্তির উৎপত্তি। যেমন, সং পুতেন>খাদ্যতে অপ. পুত্তেঁ খাই অই> বা পুতে খায়। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য মিলে যাওয়ার ফলেই অনুক্ত কর্তা বাংলায় উক্ত কর্তা হয়ে গিয়েছে। যেমন কাহ্নে গাই < কৃষ্ণেণ গায়িতম্। কৃষ্ণকঃ গায়তি; প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কর্তৃকারকের একবচনে ''-এ' বিভক্তির বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন, চর্যায় 'কুম্ভীরে খাই', 'ভাদে ভনই' (< ভদ্রকঃ ভণতি) মধ্য বাংলায়ও এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন চোরে নিল < চৌরেন নীতম্ 'না ছাড়ে নান্দের পোত্র' গাইল চণ্ডীদাসে (< গাথিতং চণ্ডীদাসেন); মূর্খে রচিল গীত ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় অনির্দিষ্ট কর্তায়- 'লোকে বলে', বাঘে খায় ইত্যাদিতে '-এ' বিভক্তির প্রয়োগ ছাড়াও পূর্ববঙ্গ এরং কামরূপের উপভাষায় কর্তায় এই বিভক্তির ব্যবহার হয়। যেমন, — মায়ে ডাকে, রামে যায় ইত্যাদি।

বাংলায় এই '-এ' বিভক্তিরই অন্য রূপভেদ '-য়', '-য়ে'-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, 'গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল', 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ', 'ঘোড়ায় গাড়ি টানে', 'ধোপায় কাপড় কাচে' ইত্যাদি।

পশ্চিমবাংলার অঞ্চল বিশেষ '-এ' বিভক্তির সঙ্গে সপ্তমীর '-ত' বিভক্তি যুক্ত হয়ে কর্তায় '-তে' বিভক্তি হয়। যেমন, 'শুনিয়া লোকেতে হাসে', 'কালো গোরুতে ভালো দুধ দেয়', 'প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে', বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

কর্ম কারক

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কর্ম কারকে কোনো বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হত না। সংস্কৃতের কর্মকারকের '-ম' বিভক্তি বিবর্তিত হয়ে প্রাচীন বাংলায় লুপ্ত হয়েছে। ফলে সেই পর্বের বাংলা কর্ম কারকে বিভক্তি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল 'চর্যাপদ' -এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ অসংখ্য উদাহরণ লক্ষ করা যায়। যেমন—

প্রাচীন বাংলায় — 'চর্যাপদে' — 'গুরু পুচ্ছিঅ জান', 'তান্তি বিবিণঅ ডোম্বী' ইত্যাদি। আদি মধ্য বাংলায় — 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র — 'চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না-পাওঁ।'

কর্ম কারকের এধরনের বিভক্তি শূন্যতার জন্য কর্তা এবং কর্মে আর কোনো পার্থক্য থাকে না।

আধুনিক বাংলার স্তরেও কর্ম কারকে বিভক্তি শূন্যতা লক্ষ করা যায়। মুখ্য কর্ম

অনির্দিষ্ট (indefinite), জড়-বস্তু (inanimate) এবং জাতিবাচক (genetic) হলে আধুনিক বাংলায় বিভক্তি যুক্ত হয় না। যেমন- বাঘে মানুষ মারে, সে ভাত খায়, কামার লোহা গরম করে, সে ফল বিক্রি করে, শিশু চাঁদ দেখে ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় গৌণকর্মে -ক < কৃতম বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ওড়িয়াতে এই '-ক' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, প্রাচীন বাংলায় — 'মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিত্তা', 'নাশক যাতী'

মধ্য বাংলায় — 'মোক বিবুধি লাগল' রাধাক বুলিল নিষ্ঠুর বাণী' আপনাক চিহ্নিআঁ। ওড়িয়ায়- পণ্ডিত মানঙ্ক বচন'। বাংলা-ওড়িয়া-হিন্দি ইত্যাদি ভাষার গৌণ কর্ম সম্প্রদান কারকের এবং সম্বন্ধ পদে ব্যবহৃত '-ক' বিভক্তিটি সংস্কৃত 'কৃত' থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই '-ক'-এর বিবর্তন তিনটি—

(ক) -কৃতম্>* -কঅ> -ক

বাংলা কর্মকারকের '-কে' বিভক্তিটিও সংস্কৃত '-কৃতঃ' থেকে আগত। এর বিবর্তন রেখাটি -কৃতঃ>-কএ>কই>-কি (হিন্দি, ওড়িয়া), -কে (বাংলা-হিন্দি-ব্রজবুলি)। এর উদাহরণ, প্রা. বা. — 'বাহবকে পারই' ম.বা. — 'কংসকে বুলিল কন্যা', 'মথুরাকে চলী ভলী', আ.বা — বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'।

বাংলা কর্মকারকে '-ক' বিভক্তি-প্রত্যয়টির উৎপত্তি সম্বন্ধে ড° সুকুমার সেন অবশ্য অন্যমত পোষণ করেন। তাঁর মতে স্বার্থিক ও বিশেষণ স্থানীয় [-ক] প্রত্যয়টি সংস্কৃতে বহুল প্রচলিত ছিল, কথ্য সংস্কৃতে এর প্রসার ও প্রয়োগ ছিল আরোবেশি। আদি মধ্যভারতীয় আর্যে এই প্রত্যয়টি দীর্ঘ ক-কারে [ক্য = ক্ক] পরিণত হয়েছিল। এর উদাহরণ অশোকের প্রত্নলিপিতে এবং অন্যত পাওয়া যায়। এই দীর্ঘীভূত ক-কার স্বাভাবিক নিয়মেই নব্য ভারতীয় আর্যে হ্রস্ব অর্থাৎ একক ক-কারে পরিণত হয়েছিল। এবং এভাবেই বাংলায় মমত্ব-জ্ঞাপক ও বিশেষণ স্থানীয় ক-কারান্ত পদের উৎপত্তি হয়েছিল। এই ক-কারান্ত পদগুলো পরবর্তীকালে র-কারান্ত পদের মতো কারক-বিভক্তি ইত্যাদি গ্রহণ করেছিল। যেমন- মোরঃ মোকঃঃ মোরি (মোরী) ঃ *মোকী) ঃঃ মোরে ঃ মোকেঃঃ *মোরু ঃ মেকে ঃঃ মোরৌ ঃ *মোকৌ ইত্যাদি। ড° সেনের মতে 'কৃত' অথবা অনুরূপ শব্দজাত অনুসর্গ বিবর্তিত হয়ে '-ক' বিভক্তির উৎপত্তি হলেও, তা তাঁর প্রস্তাবিত '-ক' প্রত্যয়-বিভক্তিজাত পদের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

বাংলায় কর্মকারকে প্রচলিত '-রে' বিভক্তির বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সম্বন্ধপদের [-র] বিভক্তির সঙ্গে করণ-অধিকরণের '-এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে গৌণ কর্মের '-রে' বিভক্তির উৎপত্তি। এর উদাহরণ—

-প্রা.বা. — "কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই', 'জিম জিম করিআ করিণিরেঁ রিসঅ', কাহের কিস ভণি' (কাকে কী বলে)

ম.বা. — "দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণারিল"

'-এ', '-তে' বিভক্তিযুক্ত অধিকরণের পদগুলোও একসময় গৌণকর্মে প্রচলিত ছিল। যেমন. ম-বাং — "কাতে নিবেদিবোঁ মোএ" (কাকে নিবেদন করব আমি)

বাংলায় কর্মকারকে প্রচলিত '-রে' এবং '-কে' বিভক্তির লোর মধ্যে -রে বিভক্তিই প্রাচীনতর তবে আধুনিক বাংলায় -'রে' -এর পরিবর্তে '-কে' বিভক্তিই অধিক প্রচলিত। '-রে' বিভক্তি কবিতার ভাষায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে বাংলার কোনো কোনো উপভাষার এর প্রয়োগ বর্তমানকালেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

করণ কারক

(ক) করণ কারকের '-এ', '-এঁ' বিভক্তি সংস্কৃত '-এন' বিভক্তি থেকে আগত। এর উদাহরণ

প্রা.বা — "আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা'; সাঁচে < সত্যেন; বেগেঁ < বেগেন; মাসেঁ < মাংসেন, হাথেঁ < প্রা. থুনং < স.হস্তেন।

শ্রী.কৃ — 'নিজ মাংসেঁ জগতের বৈরী'; 'স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।'

আ.বা — হাতে হস্তেন; 'পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে'।

'রঞ্জিয়াছ পুষ্পে পুষ্পে ধরিত্রীর বিচিত্র অলক'।

(খ) কর্ম পদের সঙ্গে 'দিআঁ' 'দিয়া' এবং অধিকরণ পদের সঙ্গে 'করিয়া' অনুসর্গ ব্যবহার করেও বাংলায় করণ কারকের অর্থ প্রকাশ করা হয়। এর উদাহরণ,

প্রা.বা. — দিআঁ চঞ্চালী (চেঁচাড়ী দিয়া),

ম.বা — 'বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী।'

আ.বা — হাত দিয়া, হাতে করে ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলা ও ওড়িয়ার সম্বন্ধ পদ থেকে জাত করণ বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, —

প্রা.বা — 'মোহের বাধা (< মোহের দ্বারা বদ্ধ), তোহরেঁ দোসেঁ (= তোর দোষ)।

বাংলায় করণ ও অধিকরণের বিভক্তি এক হওয়ার জন্য দুটি বিভক্তিই একাকার হয়ে গিয়েছিল। ফলে অধিকরণের '-ত' '-তে' বিভক্তি করণে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। যেমন, -

প্রা.বা — মুখ দুখেতেঁ (= সুখ দুঃখের দ্বারা); 'নিচিত মরিঅই'

ম.বা — "হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে"

করণ কারকের '-এঁ', '-এ' বিভক্তি দুটির প্রয়োগ কর্ম ও সম্প্রদান কারকেও পাওয়া যায়। যেমন—

প্রা.বা. — "সাখী কবির জালন্ধবী পাএ"

ম.বা — "কান্দিআ জানাইবোঁ কাঁশে", 'দেহ মোর সরস বচনে', 'মানুষ হঞা জিনিবে তুমি হেন রাবণে"।

আ.বা — "অন্ধজনে দেহ আলো, সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে"।

আধুনিক বাংলায় করণ কারকের বিভক্তিহীন রূপও লক্ষ করা যায়। যেমন — 'আজ তাহাকে চাবুকে মারেন', 'তুমি লাঠি খেলতে জান'

'-য়' বিভক্তি — নৌকার নদী পার হবে, সেবায় তুষ্ট; বিদ্যায় বৃহস্পতি, টাকায় কী না হয়।

সম্প্রদান কারক

আধুনিক বাংলায় সম্প্রদান কারকে '-এ', '-কে', '-রে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। এই বিভক্তিগুলো কর্ম কারকের বিভক্তির অনুরূপ। এর উদাহরণ- "অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে', "ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন"। 'যোগ্য বরে কন্যা দিবে।

কে — দরিদ্রকে অন্নদাও, শীতার্তকে বস্তু দাও।

তে — সমিতিতে চাঁদা দিতে হয়।

অধিকরণ কারক

সংস্কৃত ভাষার অধিকরণ কারকের বিভক্তি '-ই' বাংলায় লুপ্ত হয়েছে। বাংলায় এই বিভক্তিহীন রূপটিই প্রচলিত। যেমন- সে ঘর গেল, বাড়ি আছ হে। 'নদী এল বান'। আমি রবিবার কলকাতা যাব। আমি যে সময় গিয়েছিলাম, সে সময়ে তিনি বাড়ি ছিলেন না। 'রামদাস গুরু তার ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার ফিরিছেন যেন অন্নহীন"

আধুনিক বাংলায় অধিকরণ কারকে '-এ' (-য়ে, -য়), '-ত', '-তে' (-এতে) বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন বাংলায় '-হি' ও '-এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। ড° সুকুমার সেনের মতে প্রা.বা. '-হি' (-হিঁ) > ম.বা [-এ] বিভক্তির মূল তিনটি —

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় '*-ধি' প্রত্যয়, যেমন প্রা.বা. ঘরহি < * ঘরধি

(খ) সংস্কৃত [-ক] প্রত্যয়ান্ত শব্দে [-ই] বিভক্তি। যেমন, সং গৃহকে > ঘরত্র > ঘরই > ঘরে। দিবসকে দিবসে একইরকম ভাবে হাটে, বাটে।

(গ) -ভিস্ বা '-ভিম্' বিভক্তি। যেমন গৃহভিঃ> ঘরহি কৌণভিম >প্রা. কোণহিং প্রত্ন.বাং কোণহিঁ।

প্রাচীন বাংলার হিঅহি, হিঅহিঁ শব্দের 'হি'/হিঁ'-র মূলে একাধিক বিভক্তি চিহ্নের সম্ভাবনা ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্বীকার করেছেন, যেমন

হিঅহি, হিঅহিঁ < *হৃদয়ধি,* হৃদয়ভিম্, হৃদয়েভিঃ।

প্রাচীন বাংলায় অধিকরণের '-এ' বিভক্তি (সংস্কৃত 'ক' প্রত্যয়ান্ত শব্দে 'ই' বিভক্তি থেকে আগত) কখনো কখনো '-ই' হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, নিয়ড়ি = নিকটে। প্রাচীন বাংলায় ষষ্ঠীর '-র' বিভক্তির সঙ্গে সপ্তমীর '-এ' বিভক্তির মিলিত রূপও লক্ষ করা যায়। যেমন- "চান্দেরে চান্দকান্তি জিম পরিহাসঅ"।

সপ্তমীর '-ত' বিভক্তি সংস্কৃতের '-অন্তঃ' বিভক্তি থেকে জাত। যেমন

প্রা.বা — সাঙ্কমত (= সাঁকোতে), দুয়ারত (= দুয়ারে = দ্বারে), গঅণত (< গগণাতঃ)

ম.বাং — লোকতে, তরুত, "বাটত সৃজিআঁ দান", "সেজাত সুতিআঁ"।

এই '-ত' বিভক্তির ব্যবহার বর্তমান কালেও বরেন্দ্রী, কামরূপী এবং পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন বাড়িত' ঘরত। এই -'ত' বিভক্তির পূর্বে এবং পশ্চাতে করণ-অধিকরণের [-এ] বিভক্তি যোগ বাংলায় '-তে' এবং '-এত' বিভক্তি দুটি উৎপন্ন হয়েছে। '-তে' তৃতীয়ার আনুনাসিকের প্রভাবে হয়েছে '-তেঁ'। বাংলায় '-ত' বিভক্তি থেকে জাত '-এতে', '-এঁতে' রূপও লক্ষ করা যায়। যেমন- ঘরেতে, মেঝেতে, 'সিসতে সিন্দুর'।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ড° সুকুমার সেন কিন্তু সং. '-অন্তঃ) থেকে বাংলায় '-ত' ভিভক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ মেনে নেন নি। তাঁর মতে ন-কারের উপস্থিতি অথবা সেই স্থানে অনুনাসিকের আবির্ভাব প্রাচীন বাংলায় প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে ধরনের একটি উদাহণরও আবিষ্কার হয় নি। তিনি এই '-ত' বিভক্তির অন্য একটি উৎস নির্দেশ করে বলেছেন, 'সংস্কৃতের অধিকরণ-বাচক অব্যয় [-এ] প্রত্যয় হইতে [-ত] বিভক্তির উৎপত্তি কল্পনা করিলে সব বাধ এড়ানো যায়, অর্থসঙ্গতিও হয়'।

সম্বন্ধপদ

সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বিভক্তি চিহ্ন 'স্য' প্রাচীন বাংলাতেই লুপ্ত হয়েছিল। সেই পর্বের ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'স্য' বিভক্তি থেকে আগত '-আ', '-আহ' প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, খণহ < ক্ষণস্য; গঅণহ <গগণস্য; মূঢা (<মূঢ়স্য) হিঅহি; আই অনুঅনা (< আদি অনুৎপন্নস্য)।

সর্বনামের তির্যক কারকে এই '-আ', '-আহ' ব্যবহার পরবর্তী বাংলাতেও প্রচলিত। যেমন তাহ, তাহা, তাহার < তস্য + কার)

বাংলার সম্বন্ধ পদের বিভক্তি চিহ্ন হল '-র', '-আর' এবং '-এর'। এই গুলোর উৎস হল '-র'< কর, -আর < কার এবং -এর < কের। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক এই '-র', '-এর' বিভক্তিগুলো সংস্কৃত 'কার্য' থেকে আগত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে এই বিবর্তন রেখাটি কার্য > কাইর > কের > এর > র। তবে ড° সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন, "[কর] এবং [-কার] আসিয়াছে [-ক, -কা] + [-র] হইতে। তাহার উপর 'কর, কার' শব্দের প্রভাবও ছিল।" ড° সেনের মতে বাংলায়

'ক' প্রত্যয়ান্ত পদে '-এর' অথবা '-কে'-অন্ত পদে [-র] বিভক্তি যুক্ত হয়ে '-কের' প্রত্যয়টি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। এর উদাহরণ "নদীকের বান", "বৎসকের (= বৎসের)। তাঁর মতে আধুনিক বাংলায় 'কার' থেকে স্বরসঙ্গতির ফলে '-কের' উৎপন্ন হয়েছে। যেমন, আ.বা. "আজিকার দিনে > আজকের দিনে। ম.বা. কালিকার বড়ুয়া জগা'। মধ্যবাংলার 'আজিকা', 'আজুকা' পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

মধ্য বাংলায় খুব কম '-কর' অন্ত পদের সন্ধান পাওয় যায়। যেমন 'রূপাকার' (= রূপার, রূপার করা), তামাকর (= তামার, তামার করা)। এই বিভক্তিটি 'করা' শব্দের রূপান্তর। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের বাংলায় সম্বন্ধপদে '-ক' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- প্রা.বা 'ছান্দক বন্ধ' (= ছন্দের), 'আপন কাজক লাগি'

ম.বা — কাজক লাগি, যমুনাক তীরে, জরমক তরে।'

প্রাচীন বাংলা থেকেই '-র', '-এর' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- রুখের তেন্তলি, তোহের অন্তরে।

প্রাচীন বাংলার সম্বন্ধপদ বিশেষণ হিসেবে গণ্য হওয়ার স্ত্রীলিঙ্গে 'রি' প্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন- 'কাহরি নাবেঁ' (= কাহার নৌকায়), কাহেরি শঙ্কা (= কাহার শঙ্কা), "আপণ করি সখী" (= আপনার সখী)।

অপদান কারক

বাংলার অপদান কারকের কোনো বিভক্তি নেই। এর পরিবর্তে হইতে, থেকে, অপেক্ষা ইত্যাদি অনুসর্গে প্রয়োগ করে বাংলার অপাদানের অর্থ প্রকাশ করা হয়। তবে প্রাচীন বাংলার খুব কম ক্ষেত্রে অপভ্রষ্ট থেকে আগত 'হুঁ' বিভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, খেপহুঁ (= ক্ষেপাৎ), রঅণহু (= রত্নাৎ) প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় অপাদান কারকে কর্তা কর্ম ছাড়া তৃতীয়া, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন ব্যবহৃত হত। যেমন, চর্যায় — ডোম্বিত আগলি (ডোম্বীর বাড়া)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে — "মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী', 'আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে।"

প্রা.বা — "দশবল-রঅন হরিঅ দশদিসেঁ (= দশবল-রত্ন দশদিক হইতে আহৃত থেকে")

[দিসেঁ] < * দিশেন = দিশা);

কূলে কূল (= কূল ইহতে/থেকে কূলে) (তু. বৌদ্ধ সংস্কৃত, "কূলেন কূলম্") ডোম্বিত আগলি (= ডোম্বীর বাড়া)

ম.বা — 'ঘরত বাহির'; জ্বলতে উঠিলী রাহী; 'শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর আধুনিক বাংলায় সাধারণ প্রাতিপদিকের সঙ্গে অথবা সম্বন্ধপদের সঙ্গে অনুসর্গ যুক্ত করে অপাদান কারকের অর্থ প্রকাশ করা হয়। তেমন, "কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে';

"অনেক হইতে একের ডোরে'; 'তার থেকে তুই দূরে রবি'; "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন।" বাংলা ভাষার 'হইতে' ও 'হতে' -এর উৎস - 'ভূ' ও 'অস' ধাতু থেকে উৎপন্ন অপভ্রংশের 'হন্ত' বা 'হন্ত' পদ [হোন্ত >হুন্ত (অপভ্রংশ); সন্ত > হন্ত (অপভ্রংশ)]।

এই পদ থেকেই বাংলা উপভাষায় 'হনে' পদের উৎপত্তি হয়েছে।

৭.৩ কারক পরিচয়

এবার আমরা কারকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব।

৭.৩.১ কর্তৃকারক

সংস্কৃতে অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে কর্তার একবচনের বিভক্তি ছিল [-স]। এই অ-কারান্ত [-স] বিভক্তি প্রাকৃতে লুপ্ত হয়েছিল বলে অনুমান অথবা প্রাচ্যায় [-এ], অন্যত্র [-ও] হয়েছিল। পণ্ডিতদের অনুমান এই [-এ] বিভক্তি বাংলায় [-ই] হয়ে পরে লুপ্ত হয়। তাঁরা এর সমর্থনে দেখিয়েছেন, যেমন— পুত্রঃ>পুত্তে>পুত্তি>পুত>পুৎ, কিন্তু এর সমর্থনে প্রমাণ নেই।

স্বার্থিক অথবা ক্ষুদ্রত্ববাচক [-ক] প্রত্যয়ের সঙ্গে কর্তার একবচনে [-স] মিশে প্রাচ্যায় কে হয়েছিল এবং অর্বাচীন অপভ্রংশে [-ই] হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান। এই [-ই] শব্দের অন্ত্যস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলায় [-এ] হয়েছে। যেমন— সর্বকঃ>সব্বকে>সব্বই>সবে; অথবা পুত্রকঃ>পুত্তকে>পুত্তএ>পুত্তই>পুতে। কিন্তু আসলে এই [-এ] - বিভক্তি এসেছে করণ কারক থেকে। সংস্কৃতে অনুক্ত কর্তায় করণ বিভক্তি হত অর্থাৎ এ>ঐ>এন। যেমন— পুত্রেণ খাদতে>পুতে খায়। অতীত ও ভবিষ্যৎকালে কর্ম ও কর্তৃবাচ্য মিশে যাওয়ায় বাংলায় অনুক্তকর্তা উক্তকর্তায় পরিণত হয়েছে। যেমন- কাহ্নে গাই; গাইল চণ্ডিদাসে।

আধুনিক বাংলায় [-এ, (-য়), -তে] বিভক্তির প্রয়োগ হয় অনির্দিষ্ট কর্তা (মূলের অনুক্তকর্তা) বোঝাতে। যেমন— লোকে বলে, গরুতে ঘাস খায়, ঘোড়ায় গাড়ি টানে। উপভাষায় নির্দিষ্ট কর্তায়ও ব্যবহৃত হয়। যেমন— মায়ে ডাকে।

৭.৩.২ কর্মকারক

সংস্কৃত কর্মকারকের [-ম] বিভক্তি বাংলায় লুপ্ত হয়েছে; কর্তা ও কর্ম মিশে যাওয়ায় প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় বিভক্তিশূন্যতা দেয়া যায়। যেমন— 'গুরু পুচ্ছিঅ জান'; 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী'।

আধুনিক বাংলায় অনির্দিষ্ট, জড়বস্তু অথবা জাতিবাচক মুখ্যকর্মে বিভক্তিহীনতা দেখা যায়, যেমন— বাঘে মানুষ মারে, সে ভাত খায়; কামার লোহা গলায়।

প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় গৌণকর্মে [-ক] বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। এই [-ক] সংস্কৃত কৃত থেকে আগত (কৃত>কঅ>ক)। যেমন— 'মাথক ফুল'; 'নাশক থাতী'। কৃত থেকে জাত -কু এর প্রয়োগ— এবেঁ চিঅ-রাঅ মকুঁ পঠা। সংস্কৃত কৃত থেকে বাংলায় কর্মকারকে [-ক] বিভক্তির আগমন ঘটেছে। যেমন— প্রাচীন বাংলা বাহবকে পারই; মধ্যবাংলা 'মথুরাকে চলী ভৈলী'; আ বা 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।'

তবে সংস্কৃতে প্রচলিত স্বার্থিক ও বিশ্লেষণ স্থানীয় [-ক] প্রত্যয় থেকে বাংলা এই [-ক] বিভক্তির উৎপত্তি বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন।

ষষ্ঠী বিভক্তির [-র] বিভক্তির সঙ্গে করণ-অধিকরণের [-এ] যুক্ত হয়ে প্রাচীন বাংলার গৌণকর্মের [-রে] বিভক্তির উৎপত্তি। যেমন— কেহো কেহো তোহোরে বিরূআ বোলই।' তবে প্রাচীন বাংলার তুলনায় মধ্যবাংলায় বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্মকারকের বিভক্তিগুলি সংস্কৃতের মতো জীবন্ত।

৭.৩.৩ করণ কারক

করণকারকে [-এ, -এঁ] বিভক্তি এসেছে সংস্কৃত [-এন] থেকে। যেমন প্রা, বা. বেগেঁ<বেগেন, 'আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা'; 'স্তুতিএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।' কর্ম পদের সঙ্গে 'দিয়া' এবং অধিকরণের সঙ্গে 'করিয়া' ব্যবহার করে করণের অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন— প্রা, বা, 'দিআঁ চঞ্চালী'; আ; বা, হাত দিয়া, হাতে করে।

করণ ও অধিকরণের বিভক্তি মিশে যাওয়ার ফলে অধিকরণের বিভক্তি করণে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন— সুখদুখেতেঁ (চর্যা)।

অধিকরণ : সংস্কৃতে অধিকরণের [-ই] বাংলায় লুপ্ত হয়েছে। যেমন— বাড়ি আছ হে, 'নদী এল বান।' অধিকরণে প্রাচীন বাংলার [-হি (হিঁ)] এবং মধ্যবাংলার [-এ] বিভক্তির মূল তিনটি— (১) ইন্দোইউরোপীয়, *-ধি প্রত্যয়, (২) সং [-ক] প্রত্যয়ান্ত শব্দে [-ই] বিভক্তি, (৩) [-ভিস] বা [-ভিম] বিভক্তি। যেমন— প্রা. বা. ঘরহি<*ঘরধি; দিবসই>দিবসকে। সম্বন্ধের [-র] বিভক্তির সঙ্গেও অধিকরণের [-এ] বিভক্তির যোগ দেখা যায়। বাংলায় অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি [-এ]; করণ— অধিকরণের [-এ] যুক্ত হয়ে তা হয়েছে [তে], তৃতীয়ার অনুনাসিকের প্রভাবে [-তেঁ], পূর্বে [-এ] যুক্ত হয়ে [-এত], পূর্বাপর [-এ -এঁ] যুক্ত হয়ে [-এতে], [-এঁতে]। এই [-ত] সংস্কৃত 'অন্তঃ' থেকে এসেছে বলে অনুমান। যেমন— প্রা, বা.— সাঙ্কমতি, গঅণত; ম. বা— তরুত ইত্যাদি। বরেন্দ্রী, কামরূপীতে এই [-ত] এর প্রয়োগ আছে। কেউ কেউ বলেছেন [-ত], সংস্কৃত অন্তঃ থেকে আসেনি এসেছে সংস্কৃত অধিকরণ বাচক অব্যয় [-ত্র] প্রত্যয় থেকে।

৭.৩.৪ সম্বন্ধ

বিশিষ্ট সম্বন্ধ বিভক্তি [-র], [-এর] এসেছে যথাক্রমে 'কর (কার)' ও 'কের' থেকে। বাংলায় এগুলি সম্বন্ধ পদের সাধারণ বিভক্তি। সম্বন্ধ পদের অন্য এবং অল্প ব্যবহৃত বিভক্তি হল [-কর], [-কার] এবং [কেল, -কের]। এদের মধ্যে [-কে, -কের] প্রাচীনতর এবং এগুলি এসেছে 'কেবল' থেকে। [-কর] এবং [-কার] এসেছে [-ক], [-কা] এর সঙ্গে [-র] যুক্ত হয়ে। যেমন— আ, বা, আজিকার (<আজকের) দিন। অনেকে বলেছেন [-কের] বিভক্তি এসেছে 'কার্য' থেকে। আধুনিক বাংলায় [-কের] এসেছে স্বরসঙ্গতির ফলে 'কার' থেকে। প্রাচীন বাংলায় সম্বন্ধ পদ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গে ['রি'] প্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন— কাহেরি শঙ্কা।

বাংলায় অপঙ্গদানের পদ নেই। অতএব বিভক্তি নেই। প্রাচীন বাংলায় কখনো অপভ্রষ্ট থেকে আগত [-হুঁ (-হু)] বিভক্তি দেখা যায়। যেমন— খেপহুঁ, রঅণহুঁ ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলায় এবং মধ্যবাংলায় কর্তা কর্ম ছাড়া অন্য কারকের পদ কখনো অপদানের অর্থে প্রযুক্ত হত। যেমন—— 'কূলেঁ কূল'; 'ঘরত বাহির', ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় সাধারণ প্রাতিপাদিকের অথবা সম্বন্ধ পদের সঙ্গে অনুসর্গ যোগ করে অপাদানের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যেমন— 'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।' অপাদানের অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হত 'ভূ' ও 'অস্' ধাতু জাত 'হুন্ত,' 'হন্ত।' তবে প্রাচীন বাংলায় এর উদাহরণ নেই। এ থেকে বাংলা উপভাষাতে এসেছে 'হনে'। সাধুভাষার 'হইতে' ও চলতি ভাষার 'হতে' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বাংলায় প্রচলিত বিভক্তির বিচারে কারক এবং তার সঙ্গে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলির আনুপূর্বিক বিবরণের শেষে দেখা যায় বাংলা বিভক্তিগুলির মধ্যে [-এ] বিভক্তির প্রয়োগ সর্বাধিক এবং সমস্ত কারকেই তা ব্যবহৃত হয়।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ করুন (৪০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

বাংলা সম্বন্ধ বিভক্তিগুলি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে? (৪০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৭.৪ কারকবাচক অনুসর্গ (Post Position)

আমরা এখন কারকবাচক অনুসর্গ বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনায় বাংলায় কত প্রকারের অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় বা এই অনুসর্গগুলো কোন কোন কারকের স্থানে ব্যবহৃত হয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত অনুসর্গগুলোর উৎস নির্দেশ করা হবে।

কোনো বাক্যে কোনো পদ যদি অব্যবহিত পূর্বপদটির কারক-সম্বন্ধকে বা কারক-অর্থকে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট করে তোলে, তবে দ্বিতীয় পদটিকে অনুসর্গ বা কারকবাচক অনুসর্গ (Post Position) নামে অভিহিত করা হয়। এই কারকবাচক অনুসর্গগুলো প্রকৃতপক্ষে বিভক্তির কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে কারকের আচরণকে ব্যক্ত করে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে। আধুনিক বাংলায় কারকবিভক্তির ক্ষেত্রে তৃতীয়া ও পঞ্চমীর কোনো নির্দিষ্ট বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়না, পরিবর্তে কারকের অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কয়েকটি পদ ব্যবহার করা হয়। এই পদগুলোই অব্যবহিত পূর্বপদে কারকের অর্থ সুস্পষ্ট করে তোলে। এই পদগুলোকেই বলা হয় কারকবাচক 'অনুসর্গ'। যেমন করণ কারকের ক্ষেত্রে 'তোমার দ্বারাই একাজ সম্পন্ন হবে' বাক্যে 'দ্বারা' পদটি এবং অপাদান কারকের ক্ষেত্রে 'বিপদ থেকে রক্ষা কোরো' বাক্যে 'থেকে' পদটি কারকবাচক অনুসর্গ। বাংলায় এই কারকবাচক অনুসর্গগুলো কর্তা এবং মুখ্যকর্মে প্রযুক্ত হয়না, তবে অন্যান্য কারকের অর্থে বহুল মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। অবস্থানের ক্ষেত্রে এই অনুসর্গগুলো সাধারণত সম্বন্ধ পদের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়, যেমন অদ্বৈতের হাথে প্রভুর অদ্ভুত 'ভোজন, 'আয়িলা কংসের আগক নারদমুনী' ইত্যাদি। এই অনুসর্গগুলোর কয়েকটি আবার ব্যবহৃত হয় প্রাতিপদিকের সঙ্গে, সমাসের দ্বিতীয়পদের মতো যেমন, 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই' বা 'তোমা বই (<বহিস্—, ব্যতীত—, =বিনা) আর জানি নে" ইত্যাদি। কয়েকটি অনুসর্গকে আবার দ্বিতীয় বিভক্তি যুক্ত পদের পরেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যেমন— 'তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না'। মধ্যবাংলায় কয়েকটি মাত্র অসমাপিকা পদ অধিকরন পদের সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট রেখে উপসর্গে পরিণত হয়েছিল, এর উদাহরণ— 'গোঠে হৈতে আসি আন্মি" (=প্রথমে গোঠে থেকে অর্থাৎ অবস্থান করে তারপর সেখান থেকে)।

বাংলায় এই অনুসর্গগুলোর তিনধরনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়— (১) পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে একত্র অবস্থায়। যেমন আমি চেয়ে আছি তব মুখপানে, "আমাপানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও'। 'এরচেয়ে মৃত্যু ভালো'। 'আমাহতে এই কার্য হবে না সাধন'। (২) পূর্ণপদ হিসেবে কারকপদের পাশে স্বতন্ত্রভাবে। যেমন— 'সকলের তরে সকলে আমরা', 'গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করবে'। 'বিকাশের জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। (৩) বিভক্তিযুক্ত অবস্থায়, যেমন 'লজ্জার কারণে ইন্দ্র পালায় সত্বর', 'তোমার দ্বারায় একাব্য হবেনা।'

বাংলা অনুসর্গগুলো প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত— (১) নাম অনুসর্গ (Nomi-

nal post pention) এবং (২) ক্রিয়া অনুসর্গ বা অসমাপিকা অনুসর্গ বা ভাববাচক অনুসর্গ (Verbal বা Participal Post Position)। এর মধ্যে নাম অনুসর্গে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়া নাম অনুসর্গ গুলোকে আবার তৎসম, তদ্ভর ও বিদেশী কারকবাচক অনুসর্গের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ক্রিয়া অনুসর্গের প্রায় সবগুলোই তদ্ভব অসমাপিকা।

১) নাম অনুসর্গ (Nominal post pention)

বাংলায় নাম অনুসর্গের প্রয়োগ বহুল ও বিচিত্র। তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী প্রকারভেদে এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের প্রয়াস করা হ'ল—

(ক) তৎসম নাম অনুসর্গ

বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দ গোত্রীয় অনুসর্গ গুলোকে তৎসম নাম অনুসর্গ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—

অর্থে (নিমিত্তে) ঃ	প্রা. বা. "ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই"
ম. বাং	"গুরুর অর্থে বিকাইল ছিরিঙ্গির হাত'।
সঙ্গে (সহিত) ঃ	প্রা. বাং "ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো"
ম. বা ঃ	"বড়ায়ির সঙ্গে নিতি জাত্র।"
ম. বা.	"তই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা"
অন্তরে (উপলক্ষ অর্থে) ঃ	প্রা.বা. তোহোর অন্তরে (=তোর জন্য)
ম. বা.	"দানের আন্তরে" (=দানের বদলে)

জন্য/জন্যে (নিমিত্তে, হেতু) ঃ 'ম.বা "প্রভুর জন্য"

আ.বা. "যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য"

(খ) তদ্ভব নাম অনুসর্গ

বাংলায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দগোত্রীয় অনুসর্গগুলোকে তদ্ভব নাম অনুসর্গ বলা হয়।

আগ, আগে— (< অগ্র— ঃ'অভিমুখ')	ম. বা. ''আয়িলা কংসের আগক নারদমুনী।"
	আ. বা. "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।"
কাছ, কাছে— (< কক্ষ, অভিমুখ, সমীপ)	ম. বা. "গুরু কাছে এই ভক্তি"
	আ. বা. "তোমার কাছে এ বর মাগি"

মাঝে— (< মধ্য— ঃ অধিকরনে)	প্রা. বা. "সরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা"
	ম. বা. "বন মাঝেঁ পাইল তরাসে"
ভিতরে— (< অভ্যন্তর, অধিকরণ)	ম. বা. "প্রভু আছেন গম্ভীরা ভিতরে"
	আ. বা. "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে"
বহি—/বই— (< বহিম্—, ব্যতীত, বিনা)	ম. বা. "এ বাট বহী (=এ পথ ছাড়া)"
	আ. বা. "তোমা বই আর জানি নে।"
সম–, সঞ (<সমম্, সমেন; সহযোগ>সঙ্গ)	প্রা. বা. "হালো ডোম্বী তোএ সম করিব মো সাঙ্গ"
	ম. বা. "তা সমে কি মোর নেহা"

(গ) বিদেশী নাম অনুসর্গ

বাংলার ব্যবহৃত যে অনুসর্গগুলো বিদেশী শব্দের সাহায্যে গঠিত, সেই অনুসর্গগুলোকে বিদেশী নাম অনুসর্গ বলা হয়। যেমন—

তরে— (গৌনকর্ম ও হেতু অর্থে) ঃ	ম. বা. "বিক্রমে বলেন কৃষ্ণ মাহুতের তরে"
	আ. বা. "তোমার তরে সবাই মোরে করেছে দোষী"
বাদ/বাদে— (পশ্চাৎ পরে) ঃ	ম. বা. আজি পাঠ বাদ যায়
< আরবি ba'd, ফারসি, bād)	আ. বা. তিন ঘণ্টা বাদে স্কুল ছুটি হবে
বদল- (পরিবর্তে, < আরবি badal)	ম. বা. "যশোদা তনয়া গুপ্তবেশে কৃষ্ণের বদলে আনি দিল বসুদেবে।"

	আ. বা. "আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা"
	"আমি মরি তোমার বদলে"
বরাবর— (অভিমুখ, সমীপ)	ম. বা. "কংস বরাবরে বার্তা জানাইল নির্ভয়"
< ফারসি, bar-ā-bar)	"আন লো তোমার প্রভু মোর বরাবরি"
	জীবন তেজিব আমি তোমা বরাবরি
	আ. বা. হাকিমের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করা হল।
হুজুর (< আরবি hazur, অভিমুখে, সমীপে)	ম. বা. "ধরিয়া হুজুরে তারে আন উপনীত হইল গিয়া রাজার হুজুরে"
	আ. বা. "আসামি বিচারকের হুজুরে দাঁড়াই।"

√

(২) ক্রিয়া অনুসর্গ / ক্রিয়া অসমাপিকা অনুসর্গ / ভাব বাচক অনুসর্গ

কর ঃ করি, করিয়া (ক্রিড়া বিশেষণের অর্থে কর, তৃতীয়া)

প্রা. বা.	দিঢ় করিঅ (=দৃঢ়ম) থির করি
আ. বা.	জোর করে, ভালো করে
গ— (i) গই অধিকরনে,	প্রা. বা. কহি গই পইঠা (= কুত প্রবিষ্টঃ)
(ii) গিয়া	ম. বা. আপনে রহিলা রোহিণীর গর্ভ গিআঁ
√ লগ লাগিয়া (চতুর্থী)	ম. বা. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
√ চাহ, চাহিয়া (পঞ্চমী)	ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন রাসের চাইতে শ্যাম বড়ো। রামের চাইতে শ্যাম বড়ো।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে বাংলায় এই কারকবাচক অনুসর্গগুলোর বিবর্তনের ইতিহাসটি যথেষ্ট চমকপ্রদও কৌতুহলোদ্দীপক। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বৈদিক ভাষায় উপসর্গ (Preposition) ছিল যথেষ্ট স্বাধীন। উপসর্গীয় অব্যয়গুলো নামপদের ক্ষেত্রে নামপদের কারক নিয়ন্ত্রণ করত এবং ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে

ক্রিয়ার অর্থকে সীমিত করত। ভাষার বিবর্তনের ক্ষেত্রে নামবাচক উপসর্গের প্রাধান্য ক্রমশ কর্মতে থাকে। প্রাকৃতের পর্যায়ে প্রাচীন উপসর্গের ব্যবহার বা প্রয়োগ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেগুলোর স্থান গ্রহণ করে কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গ স্থানীয় বিভিন্ন পদ। বিভিন্ন বিভক্তির অবলুপ্তির জন্য কারকের অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে নামবাচক এবং ভাববাচক বা অসমাপিকা অনুসর্গ পদ ব্যবহৃত হতে শুরু করে। বাংলার এই অনুসর্গগুলেই বহুক্ষেত্রে কারকের অর্থ সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট করে দেয়। কর্তা ও কর্ম ছাড়া অন্যান্য কারকে প্রযুক্ত এই অনুসর্গগুলোর কারকগত এক বিবরণ—

গৌণকর্ম ও সম্প্রদান

গৌনকর্ম ও সম্প্রদানে প্রযুক্ত অনুসর্গগুলোৰ মধ্যে 'প্রতি', 'বিদ্যমান' প্রভৃতি তৎসম নাম অনুসর্গ এবং 'কাছে'. 'পানে' প্রভৃতি তদ্ভব নাম অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

তৎসম	প্রতি— ম. বা. তবে কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন',
(গৌন কর্ম, অভিমুখ)	
বিদ্যমান— (অভিমুখে)	ম. বা. "জিজ্ঞাসিলা দামোদর নন্দ বিদ্যমান"
তদ্ভব	কাছ (< কক্ষ,) "আমার কাছে কী চাও, কার কাছ থেকে আসছ"
পানে (< পর্ণ)	"মোর পানে আল রাধা (ম.বা.)"
বিদেশী	তরে (গৌনকর্ম, হেতু অর্থে) ম. বা. "বিক্রমে বলেন কৃষ্ণ মাহুতের তরে"
আ. বা.	"তোমার তরে সবাই মোরে কারছে দোষী"
বরাবর (গৌনকর্ম, —চতুর্থী)	হাকিমের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করা হল।

করণ

(ক) তৎসম

সঙ্গ ঃ "ডোম্বী-নর সঙ্গে জো জেই রত্তো।"

সমভিব্যাহার ঃ "সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাম বনে গমন করিলেন।"

সহিত ঃ ম. বা. "ঠামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিখ বাণী।"

বিনা ঃ "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হোল মোর শিরে।"

(খ) তদ্ভব

সাথে < সার্থ ঃ "তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি ঐ খেলাতে।"

সনে < সন্ন ঃ "আম্মাসনে হেন 'তেজু পরিহাস" (ম. বা.)

অপাদান

অপাদান কারক সূচক অনুসর্গগুলোর মধ্যে তৎসম 'বিনা', 'পর' ইত্যাদি অনুসর্গ, তদ্ভব অনুসর্গের মধ্যে 'ঠাত্র', অপভ্রংশ ভূ ও অস্ ধাতুর শতৃপদ হোন্ত থেকেজাত 'হন্ত' অনুসর্গ এবং বিদেশী 'বাদ' ইত্যাদি অনুসর্গের প্রচলন লক্ষ করা যায়।

(ক) তৎসম

বিনা (ব্যতীত) ঃ "যে দিন গেছে তোমাবিনা"

পরৎ (পশ্চাৎ) ঃ "দিনের পরে দিন যে গেল"

(খ) তদ্ভব

ঠাত্র (< স্থান) ঃ মঠা — "য় ব্রহ্মার ঠাত্র"

হৈতে ঃ "গোঠে হৈতে আসি আম্হি" ম.বা.

(গ) বিদেশী

বাদ ঃ আরো এক ঘণ্টা বাদে এখানে এসো। আ. বা.

অধিকরণ

(ক) তৎসম

সন্নিধান (নিকট, অভিমুখ) ঃ ম. বা "হরষে আসিয়া বীর কৃষ্ণ সন্নিধান"

(খ) তদ্ভব

মাঝ (< মধ্য) ম. বা "বন মাঝে পাইল তরাসে"

ভিতর (< অভ্যন্তর) "কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে"

৭.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আলোচ্য বিভাগে কারক ও বিভক্তি, কারক বাচক অনুসর্গ আলোচিত হয়েছে। কতৃকারক, কর্মকারক, করণ-অধিকরণ ও সম্বন্ধ-সহ কারক বাচক অনুসর্গের তদ্ভব, অর্ধতৎসম, তৎসম ও বিদেশী অনুসর্গের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

৭.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। অনুসর্গ কাকে বলে? কারক বাচক অনুসর্গ কোনগুলি? এবং এই সব অনুসর্গ বাংলায় কীভাবে ব্যবহৃত হয় বুঝিয়ে দিন।

২। বাংলার কারক বিভক্তিগুলির পরিচয় দিন এবং তাদের ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়াটি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করে দেখান।

৩। বাংলা কারক, বিভক্তি কোনগুলি? এই বিভক্তিগুলির প্রত্যেকটির উৎস ও পারম্পর্য নির্ণয় করে দেখান।

৪। অনুসর্গ কি? কারকবাচক অনুসর্গ কাকে বলে? বাংলা অনুসর্গগুলির উৎপত্তি, ভূমিকা ও বিশেষত্ব নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৫। কারকবাচক অনুসর্গ বলতে কী বোঝেন? বাংলায় কতপ্রকারের অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় তা দেখিয়ে এই অনুসর্গগুলির উৎস নির্দেশ করুন।

৭.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৮

উপসর্গীয় প্রত্যয়, বাংলা উপসর্গ, লিঙ্গ, ক্রিয়ার কাল ও ধাতু

বিষয় বিন্যাস

৮.০ ভূমিকা (Introduction)
৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৮.২ উপসর্গীয় প্রত্যয়
৮.৩ বাংলা উপসর্গ
৮.৪ লিঙ্গ
৮.৫ ক্রিয়ার কাল
৮.৬ ধাতু : বৈচিত্র্য ও উৎস
৮.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৮.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৮.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৮.০ ভূমিকা (**Introduction**)

বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের পিছনে ব্যাকরণগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে উপসর্গীয় প্রত্যয়, বাংলা উপসর্গ, লিঙ্গ, ক্রিয়ারকাল, ধাতু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগে আমরা উপসর্গীয় প্রত্যয়, বাংলা উপসর্গ, লিঙ্গ, ক্রিয়ার কাল, ধাতু প্রভৃতি আলোচনা করব।

৮.১ উদ্দেশ্য (**Objectives**)

এই বিভাগ থেকে আপনারা জানতে পারবেন—

- উপসর্গীয় প্রত্যয়
- বাংলা উপসর্গ
- লিঙ্গ
- ক্রিয়ার কাল
- ধাতুর বৈচিত্র্য ও উৎস সম্পর্কে।

৮.২ উপসর্গীয় প্রত্যয়

আমরা এখন উপসর্গীয় প্রত্যয় বলতে কী বোঝায় এবং বাংলায় এই ধরনের প্রত্যয় প্রয়োগ কীভাবে ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করব।

যে সব প্রত্যয় শব্দের পূর্বে বসে উপসর্গের কার্য সমাধাকরে, তাকে উপসর্গীয় প্রত্যয় বা গতি (Prefix) বলা হয়। যেমন, অবুঝ, অনাবৃষ্টি, নিখরচা, আড়-চাউনি, বেসামাল, ফুলহাতা ইত্যাদি।

বাংলায় ব্যবহৃত উপসর্গীয় প্রত্যয়গুলোকে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী উপসর্গীয় প্রত্যয় নামে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

(ক) তৎসম — অর্ধতৎসম উপসর্গীয় প্রত্যয়

বাংলায় ব্যবহৃত অ-, আ-, অন-, অনা- নঞর্থক উপসর্গীয় প্রত্যয়গুলোর উৎস সংস্কৃত নঞর্থ শব্দাংশ 'অ-' এবং তার রূপান্তর 'অন-'। সংস্কৃতে এই নঞর্থ শব্দাংশটি ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে 'অ-' রূপে এবং রূপান্তরিতভাবে স্বরধ্বনির পূর্বে 'অন-' রূপে প্রযুক্ত হত। তবে এটি উপসর্গ বা প্রত্যয় হিসেবে পরিগণিত হত না, নঞর্থ শব্দের সমাসবদ্ধরূপের পূর্বপদ হিসেবেই পরিচিত হত। যেমন- অ-শেষ, অন্-অবসর, বাংলায় এই নঞর্থ শব্দাংশের 'অ-' প্রত্যয়টি কখনো 'আ-' রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। 'অন-' থেকে 'অনা-' রূপটিরও উদ্ভব হয়েছে।

অ ঃ অকাজ, অজানা

আ ঃ আ-কাচা, আকাল, আগোছালো, আ-দেখ্‌লা, আ-সক্‌ড়ি, আলুনি,

অনা ঃ অনহিত

অনা ঃ অনাদৃষ্টি, অনামুখ

বাংলা উপভাষা সুভাষণ রীতিতে 'অ-' স্বার্থিক উপসর্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- অ- মন্দ (= মন্দ), অ-কুমারী (= কুমারী), অঘোর (= ঘোর) নিদ্রা,

এছাড়াও সাদৃশ্য বা প্রকৃষ্ট অর্থে 'অ-/আ-' -এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন আকাঠ (= কাঠের মতো মূর্খ), আখাম্বা ইত্যাদি।

বাংলার আরেকটি নঞর্থ উপসর্গীয় প্রত্যয় 'নি-' -এর উৎস নিরূপণে ড° সুকুমার সেন সংস্কৃত 'নহি'র সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে এর ওপর সংস্কৃত উপসর্গ 'নি-' -এর প্রভাব থাকতে পারে। তবে ড° পরেশচন্দ্র মজুমদার সংস্কৃত 'নির-' ও 'নি-' দুটি নঞর্থ উপসর্গের উৎস নির্দেশ করেছেন। বাংলায় এই 'নি-' উপসর্গীয় প্রত্যয়ের উদাহরণ - নিখরচা, নিখুঁত, নির্জলা, নিখোঁজ, নিকড়িয়া, নি(ঃ) সাড়ে ইত্যাদি।

বাংলায় ব্যবহৃত বিনা, বিনি উপসর্গীয় প্রত্যয়ের উৎস সংস্কৃত 'বিনা-'। যেমন, 'বিনি সুতোর মালা', 'বিনা-কাব্যের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি'।

ড° সুকুমার সেন নির্দেশিত উপরি উক্ত উপসর্গীয় প্রত্যয়গুলো ছাড়াও ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার কু-, স-, সু-, বি- ইত্যাদিকেও তৎসম উপসর্গীয় প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সং. কু — ঃ কুকাজ, কুকর্ম, কুনজর

সং. বি — ঃ আ. বা — বিজোড়, বিভুঁই, বিকাল, প্রা. বা — বিখলা, বিবুধি, বিহড় (বিঘট)

সং. স — ঃ (সহিত অর্থে) ঃ সঠিক, সজোরে, স-বুট (পদাঘাত), স-শব্দে,

সং. সু — ঃ সুখবর, সুদিন, সুজন ইত্যাদি।

(খ) **তদ্ভব উপসর্গীয় প্রত্যয়**

বাংলা ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দ গোত্রীয় উপসর্গগুলোকে তদ্ভব উপসর্গীয় প্রত্যয় নামে অভিহিত করা হত।

আঠ — (< প্রা. অদ্ধ < সং. অর্ধ-অর্দ্ধ) ঃ আঠ-ফোটা, আঠ-পাগলা, আধ-জাগন্ত, আঠো-আলো।

আড় — (< প্র. অড্ঢ < সঃ অর্দ্ধ) ঃ আড়-চাউনি, আড়-পাগলা, আড়-খেমটা, আড়-ঘোমটা।

ভর্ — (< সং. ভরিত < ভৃ) ঃ ভরদিন, ভরপেট, ভর-সাঁঝ, ভর (া)-যৌবন,

হা — (< প্রা. হঅঅ < সংহত-ক) ঃ হাপুত, হাঘরে (< হাঘরিয়া), হাভাতে (< হাভাতিয়া)

(গ) **বিদেশী উপসর্গীয় প্রত্যয়**

বাংলায় বেশ কয়েকটি বিদেশী শব্দ ও প্রত্যয় উপসর্গীয় প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। এইগুলোকে ফারসি ও ইংরেজি শব্দ ও প্রত্যয় ভেদে ফারসি উপসর্গীয় প্রত্যয় এবং ইংরেজি উপসর্গীয় প্রত্যয় নামে দুটি উপ-বিভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

(ঘ) **ফারসি উপসর্গীয় প্রত্যয়**

ড° সুকুমার সেন 'দর-', 'ফি-', এবং 'বে-' উপসর্গীয় প্রত্যয় তিনটিকে ফারসি থেকে আগত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ড° পরেশচন্দ্র মজুমদার গর-, দর-, নিম-, বদ-, 'হর-' ইত্যাদিকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এগুলোর পরিচয়—

দর — (নিম্ন বা কম অর্থে) ঃ দরকাঁচা/দরকচা, দরপত্তনি, দরদালান,

ফি — (< ফা. ফী, প্রত্যেক অর্থে) ঃ ফি - মাস, ফি - হপ্তা, ফি-লোক,

বে — (নঞর্থে, নিন্দার্থে) ঃ বেচাল, বেসামাল, বে-হেড (ইং head), বে-বুঝ, বে-ধড়ক, বেবাক (< বে + বাকি = সমস্ত)

গর — (< ফারসি-আরবি গ.ইব্ = ব্যতীত, নঞর্থে) ঃ গরমিল, গরহাজির, গররাজি

নিম — (< আরবি নইমা (= অর্ধ) ঃ নিমখুন, নিমরাজি

বদ — (নিন্দার্থে) ঃ বদ্‌মেজাজি, বদলোক, বদ-গন্ধ

হর — (প্রত্যেক বা সর্ব অর্থে) ঃ হর-দিন, হররোজ, হরবোলা ইত্যাদি।

(ঙ) ইংরেজি উপসর্গীয় প্রত্যয়

ইংরেজি হেড্ (head), ফুল (full), হাফ্ (half) ইত্যাদি বাংলা উপসর্গীয় প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

হেড্ - ঃ হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলবি, হেড-বাবু, হেড-মিস্ত্রি

ফুল - ঃ ফুল-বাবু, ফুল-হাতা, ফুল-আখড়াই

হাফ - ঃ হাফ-দাতা, হাফ-আখড়াই, হাফ-বাবু ইত্যাদি।

৮.৩ বাংলা উপসর্গ

কোনো একটি পদের অর্থকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার জন্য কখনো কখনো অন্য একটি পদ সেই পদের ঠিকপূর্বে সমাসবদ্ধ অবস্থায় বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্ত হয়। এই ধরনের পূর্বপদটিকে বলা হয় উপসর্গ (Preposition)। সাধারণত সংস্কৃতে প্র, পরা, অপ, সম্, নি ইত্যাতি কুড়িটি অব্যয় নামপদ বা ধাতুর-পূর্বে প্রযুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। এই অব্যয়গুলোকে উপসর্গ বলা হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের প্রথম স্তর অর্থাৎ বৈদিক ভাষার আ, অধি, পরি, অনু ইত্যাদি উপসর্গের প্রকৃতি ছিল যথেষ্ট স্বাধীন। এগুলো সেই যুগে পৃথক পদ হিসেবেও ব্যবহৃত হত। সেই যুগে উপসর্গীয় অব্যয়গুলো নাম পদ বা ক্রিয়াপদের ঠিকপূর্বে উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও নামপদ বা ক্রিয়াপদের ঠিক পরে বা বাক্যমধ্যে অন্যত্র দূরবর্তী স্থানে বিচ্ছিন্নভাবেও অবস্থান করতে পারত, নামপদের ক্ষেত্রে এগুলো নামপদের কারক নিয়ন্ত্রণ করত এবং ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে ক্রিয়ার অর্থকে সীমিত করত।

বৈদিকের পর সংস্কৃতের পরবর্তী পর্যায়ে নাম বাচক উপসর্গের প্রাধান্য ক্রমশ কমে যায়। প্রাকৃতের পর্যায়ে উপসর্গের ব্যবহার প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের যে উপসর্গগুলো অবিকৃতভাবে বা মধ্যভারতীয় আর্যের বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব প্রকারভেদে বিভক্ত করা হয়। বাংলায় এই উপসর্গগুলো কয়েকটি অনুসর্গ হিসেবেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

(ক) **তৎসম উপসর্গ**

প্রতি ঃ ম. বা. — "প্রতি বোল ননন্দ বাছে"

রতি প্রতি

আ. বা — প্রতি দিন

সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে কেবল এই 'প্রতি' উপসর্গটিই বাংলায় বিশিষ্টপদ সমাসের মতো বাংলায় সর্বনাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অনুসর্গ হিসেবে 'প্রতি' বাংলায় প্রযুক্ত হয়। যেমন - টাকা প্রতি এক পয়সা সুদ।

বিনা ঃ 'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'

"বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমর নাম'

(খ) **অর্ধতৎসম উপসর্গ**

বিনি (< বিনা) : ম. বা — "বিনি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন"

'কাহ্ন বিনী'

আ. বা — বিনি পয়সার ভোজ

বাংলায় 'বিনি', 'বিনে' অনুসর্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন "তোমা বিনে মোর চিত্তে আন নাহি ভায়।"

বিন্ধ ঃ প্রা. বা — বিনু আয়াসেঁ

মাঝ (< মধ্য) : ম. বা — গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে'

[বন মাঝে (অনু), "বাঁশি বাজে বন মাঝে কি মন মাঝে"]

আ. বা — মাঝ দরিয়ার ফেলে জাল কিনারায় বসে টান'

৮.৪ লিঙ্গ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা এবং সংস্কৃতে পদকে সুবন্ত, তিঙন্ত ও নিপাত নামে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই সুবন্তের বা নামপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম। এই তিনটি পদে অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম (প্রথম পুরুষ) লিঙ্গভেদ প্রচলিত ছিল। এই লিঙ্গভেদ ছিল তিন প্রকারের — পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীব লিঙ্গ। লিঙ্গভেদ বা লিঙ্গ বিচারের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় যোগের প্রবণতা লক্ষ করা যেত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাকরণ সিদ্ধতার (Gramatical) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। ড° সুকুমার সেন এই প্রবণতাকে 'প্রত্যয় সিদ্ধ'

এবং 'ব্যবহার সিদ্ধ' নামে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে স্বরান্ত পদে লিঙ্গভেদের স্বরূপ 'প্রত্যয় সিদ্ধ' ছিল, কিন্তু ব্যঞ্জনান্ত পদে বিশেষভাবে 'ব্যবহার সিদ্ধ' ছিল। যেমন সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-জ্ঞাপক কোনো বিশিষ্ট প্রত্যয় না থাকায় 'অয়ম', 'ইয়ম' এবং 'ইদম' শব্দে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গকে সূচিত করা হত। বিশেষ্য পদের 'মরুৎ' ছিল পুংলিঙ্গ, 'সরিৎ' হল স্ত্রীলিঙ্গ, আবার 'যকৃৎ' হল ক্লীব লিঙ্গ।

স্বরান্ত শব্দের মধ্যেও আবার শব্দের অর্থবোধের ওপর ভিত্তি করে লিঙ্গ বিচার করা হত। যেমন 'মিত' শব্দ 'সূর্য' অর্থে পুংলিঙ্গ বলে বিবেচিত হত, এবং তার শব্দরূপ হত 'নর' শব্দের মতো, কিন্তু সেই একই 'মিত্র' শব্দ 'বন্ধু' অর্থে ব্যবহৃত হলে, তা ক্লীব লিঙ্গ বলে বিবেচিত হত এবং তখন তার শব্দরূপ হত 'ফল' শব্দের মতো। ঠিক একই রকমভাবে ও-কারান্ত 'গো' শব্দ ষাঁড় বা বলদ (Ox or Bull) অর্থে প্রযুক্ত হলে তা হত পুংলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু সেই একই 'গো' শব্দ ধেনু (cow) অর্থে ব্যবহৃত হলে, তা হয়ে যেত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। বহু ক্ষেত্রে আবার শব্দের প্রকৃতি বিচার করে শব্দের লিঙ্গ নির্ণয়ে রীতিও প্রচলিত ছিল। যেমন স্ত্রী-ত্ব বাচক বা স্ত্রী-ত্ব নির্দেশক শব্দ 'দার' পুংলিঙ্গ বলে বিবেচিত হত, সেক্ষেত্রে 'জায়া' হত স্ত্রী লিঙ্গ এবং 'কলত্র' হত ক্লীব লিঙ্গ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের পরবর্তী পর্যায়ে '-আ' এবং '-ই' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশের এক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এরফলে ব্যঞ্জনান্ত প্রাচীন স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দগুলো নতুন করে স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণ করে নবরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন বাচ>বাচ্য, দিশ্ >দিশা, নিশ্>নিশা, নাস্>নাসা, নাসিকা। এই দুইটি স্ত্রী প্রত্যয়ের মধ্যে 'আ' প্রত্যয়টি প্রধান ছিল এবং তা স্ত্রীজাতিকে নির্দেশ করত। তবে মধ্য ভারতীয় আর্যের পর্বে এই আ-কারান্ত স্ত্রী-লিঙ্গ নির্দেশক প্রত্যয়টি লুপ্ত হয়ে যায় এবং যৌন সম্পর্ক বা পত্নী সম্পর্ক সূচক ঈ কারান্ত প্রত্যয়টি প্রধান হয়ে ওঠে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার পদান্ত আ-কারের অ-কার প্রবণতার জন্য আ-প্রত্যয়টি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায় ফলে অপভ্রষ্টে এবং নব্য-ভারতীয় আর্যে স্ত্রী-প্রত্যয় হিসেবে কেবল 'ঈ' প্রত্যয়টিই টিকে থাকে।

অপভ্রষ্ট পর্যায়ে আ-কারান্ত পদ অ-কারান্ত পদে পরিণত হলে, প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্যের পর্বে তা পূর্ববর্তী ই-কারের সঙ্গে এক অন্তসন্ধির ফলে 'ঈ' কারে পরিণত হয়। প্রাচীন বাংলায় এধরনের পদান্ত সামঞ্জস্য জাত (concord) স্ত্রীলিঙ্গ সূচক 'ঈ' প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- 'হাভেরি মালী', 'লাগেলি আগি', 'তোহোরি কুড়িআ'। এই উদাহরণগুলোতে প্রাচীন বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ সূচক বিশেষ্যপদের সঙ্গে যে বিশেষণ পদেও স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হত তা লক্ষ করা যায়। আদি মধ্য যুগের বাংলায়ও বিশেষণ পদে এধরণের স্ত্রী-প্রত্যয় প্রয়োগের রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন 'উত্তরলী হইলী (হয়িলী) রাহী', 'বাশীর নাদে', 'কোঅলী পাতলী বালী' ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় বিশেষ্যণ বা কর্তার লিঙ্গানুসারে ক্রিয়াপদে লিঙ্গ নির্দেশক প্রত্যয় প্রযুক্ত হত। স্ত্রী-লিঙ্গের কর্তার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন- 'ঈষত হাসিলী চন্দ্রাবলী', 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী' ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা ভাষায় বর্তমানে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে আর স্ত্রী-প্রত্যয় হত না। বর্তমানে বাংলায় লিঙ্গ নির্দেশ সম্পূর্ণভাবেই অর্থনির্ভর। অর্থাৎ কোনো শব্দ দিয়ে নির্দেশিত বস্তু বা প্রাণীর লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করেই শব্দটির লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়। যেমন পুরুষজাতীয় প্রাণীকে বোঝালে তা পু-লিঙ্গ, স্ত্রী-জাতীর প্রাণীকে বোঝালে স্ত্রী-লিঙ্গ এবং অপ্রাণীবাচক বস্তুকে বোঝালে ক্লীব লিঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যর সূত্রেই 'ছেলে' শব্দ পু-লিঙ্গ এবং 'মেয়ে' শব্দ স্ত্রী-লিঙ্গ সূচক হিসেবে পরিগণিত হয়। অপ্রাণীবাচক ঘড়ি বা কলম হয়ে ওঠে ক্লীব লিঙ্গ।

আধুনিক বাংলা ভাষায় স্ত্রী-লিঙ্গ সূচক শব্দ গঠন বা পুংলিঙ্গ শব্দের লিঙ্গান্তর সংঘটিত হয় মূলত পাঁচ ভাবে। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র মজুমদার এই পাঁচটি সূত্রকে নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত করেছেন —

১। স্ত্রী-বাচক প্রত্যয় যোগে —

বাংলা ভাষায় স্ত্রী-বাচক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে -নী, -ইনী, -আনী প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যেমন—

- নী ঃ পত্নী

- ইনী ঃ ধনিনী, এই প্রত্যয়টি প্রধানত বৃত্তি নির্দেশক। প্রাচীন বাংলায় এর উদাহরণ। শুণ্ডিনী নারী (শুড়ি নারী) ইত্যাদি, মধ্য বাংলায় এর উদাহরণ 'গোয়ালিনী' এবং আধুনিক বাংলার উদাহরণ- 'গয়লানী', 'মজুরণী' ইত্যাদি।

পত্নী অর্থেও [-(ই) নী] প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—

মধ্য বাংলা — গোপিনী, বানিয়ানি

আধুনিক বাংলা — বেনেনী, গুঁড়িনী, চাষানী, পুরুৎনী ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যবাংলার এই [-ইনী] প্রত্যয়টি আধুনিক বাংলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে [-ইন] হয়েছে। যেমন-

সই সাঙ্গাতিন < সং সঙ্গপাতিনী

নাতিন < নাতিনী/নাতনী,

মিতিন < সং মিতিনী

বেয়ান < বেহাইন

[-ঈ (ই)] < সং - ঈ, -ইকা ঃ এই প্রত্যয়টি জাতি নির্দেশক। যেমন — বামনী, ঘুড়ি, হাঁসী, চকী, মামী, (মামি), কাকী ইত্যাদি।

ভারতীয় ভাষার লিঙ্গ নির্দেশক প্রত্যয়গুলোর বিবর্তনের ফলে অপভ্রষ্ট ও প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্যের পর্বে নতুন করে -ই (-ঈ)- কারান্ত শব্দগুলো স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হলে, নতুন করে আ-কারান্ত সহযোগী শব্দ পুংলিঙ্গ বলে বিবেচিত হতে থাকে। এ-থেকেই পুংলিঙ্গ প্রত্যয় '-আ'-কারের উৎপত্তি। বাংলায়ও পুংলিঙ্গ নির্দেশক এই '-আ' প্রত্যয়টির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- প্রা. বাং - হরিণা-হরিণীর নিলঅ ন জানী। জোইআ-জোইনী আ-বাং-হাঁসা-হাঁসী, চকা-চকী, বগা-বগী ইত্যাদি।

২। স্ত্রী-বাচক শব্দ যোগে —

সংস্কৃত ভাষায় পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ থেকে আলাদা ভাবে উদ্ভূত শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর নির্দেশ করা হয়। যেমন- পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা বাংলায়ও এই রীতি লক্ষ করা যায়। যেমন - বাবা-মা (বাপ-মা), ভাই-বোন, রাজা-রানি।

বিদেশী থেকে নতুন শব্দ গ্রহণ করেও এইধরনের লিঙ্গান্তর নির্দেশ করা হয়। যেমন — চাকর (ফা.)- ঝি (<দুহিতা), চাকরানি, খানসামা (ফাং)-আয়া (পর্তু), সাহেব-বিবি, মেম (< ইং Madam, Maam) নবাব-বেগম ইত্যাদি।

৩। স্ত্রী-ত্ব বাচক বিশেষণ শব্দ যুক্ত করে। যেমন-বেটাছেলে-মেয়েছেলে, কবি-মহিলা কবি, মদ্দাচিল-মাদীচিল, এঁড়ে (নই) বাছুর-বক্না বাছুর। গাই-গরু, মাদি ঘোড়া বৃক্তি বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দও এভাবে গঠিত হয়। যেমন— মেয়ে মাস্টার, মেয়ে-ডাক্তার, মেয়ে-উকিল ইত্যাদি। ড° সুকুমার সেন এই রীতিতে ফারসির অনুকরণ লক্ষ করেছেন।

৪। বিষমচ্ছেদ (Melanalysis, Back formation) প্রক্রিয়ার ফলেও কিছু স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ থেকে পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন পিসা< পিউসা (: পিউসী, <* পিতুঃস্বসৃ) মেসো < মাসুয়া, মাউসা (: মাসী, মাউসী <* মাতুঃস্বসৃ)

৫। স্ত্রী-ত্ব বাচক প্রত্যয়ের দ্বিত্ব প্রয়োগের ফলে। যেমন ননদ < সং-ননান্দৃ (স্ত্রী)/ ননদিনী)

৮.৫ ক্রিয়ার কাল

প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতে ক্রিয়ারূপের বিপুল সম্ভার লক্ষ করা যায়। সংস্কৃতে ক্রিয়াপদের কাল ছিল ছয়টি। এর মধ্যে বর্তমানের রূপ ছিল একটি (লট বা present), অতীতের রূপ ছিল তিনটি (১) লঙ্ অর্থাৎ অসম্পন্ন বা Imperfect, (২) লুঙ্ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট বা Aorist, এবং (৩) লিট্ অর্থাৎ সম্পন্ন অতীত বা perfect) এবং ভবিষ্যতের রূপ ছিল দুইটি (১) লৃট্ বা future ও (২) লৃঙ্ অর্থাৎ সম্ভাব্য অতীত বা conditional)। ক্রিয়ার কালের এই ছয়টি রূপের সঙ্গে আবার যুক্ত হত ভাবের (Mood) মাত্রা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ভাব (Mood) ছিল পাঁচটি — (১) নির্দেশক বা অবধারক (Indicative), (২) অনুজ্ঞা (Imperative), (৩) নির্বন্ধ (Injunctive), (৪) অভিপ্রায় (Subjunctive) এবং (৫) সম্ভাবক (optative)। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা ক্রিয়ার কাল ও

ভাবকে একসঙ্গে বিচার করে ক্রিয়াপদের মোট এগারোটি রূপভেদ নির্দেশ করেছিলেন। এই রূপভেদগুলো হল — (১) লট্ — নির্দেশক বর্তমান (Indicative present), (২) লোট্ — বর্তমান অনুজ্ঞা (Imperative present), (৩) লঙ্ — সামান্য অতীত (Imperfect), (৪) বিধিলিঙ — সম্ভাবক (optative), (৫) লিট্ — পরোক্ষ অতীত (perfect), (৬) লুঙ — নির্দেশক অতীত (Aorist), (৭) লৃট — নির্দেশক ভবিষ্যৎ (Indicative Future), (৮) লৃঙ — সম্ভাব্য (conditional), (৯) লুট — নির্দেশক ভবিষ্যৎ (Periphrastic Future), (১০) আশীর্লিঙ — আশীর্বাদ-নির্দেশক (Benedictive) এবং (১১) লেট — অভিপ্রায় (Subjunctive)।

তবে সংস্কৃতের ক্রিয়ার কাল ও ভাবের এই বিপুল রূপভেদ পরবর্তীকালে অক্ষুণ্ণ থাকে নি। মধ্যভারতীয় আর্যের স্তরে অতীত কালের তিনটি রূপই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই পর্বে আবার নতুনভাবে অতীত কালের রূপ গঠিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় ভবিষ্যৎ কালের রূপ প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সুতবাং সেক্ষেত্রেও নতুনভাবে ভবিষ্যৎ কালের রূপ গঠিত হয়েছিল। এভাবেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কালের রূপগুলির মধ্যে বাংলায় কেবলমাত্র বর্তমানের রূপটিই টিকে আছে। ভাবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের পাঁচটি ভাবের মধ্যে মধ্যভারতীয় আর্যে কেবল অনুজ্ঞা ও সম্ভাবক রূপ দুটিই টিকে ছিল। বাংলা নির্দেশক (অর্থাৎ সাধারণ) এবং অনুজ্ঞা ভাবের রূপই প্রযুক্ত হয়।

বাংলা ক্রিয়াপদের রূপবৈচিত্র্য বিচার করলে মোট আটপ্রকার ক্রিয়ার কালের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হল — সাধারণ বর্তমান, সাধারণ অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ, নিত্যবৃত্ত অতীত, ঘটমান বর্তমান, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত। এর মধ্যে প্রথম চারটিকে সরল কাল বা Simple Tense এবং পরবর্তী চারটিকে যৌগিক কাল বা Compound Tense নামে অভিহিত করা হয়। সরল কালকে আবার মৌলিক কাল বা Participal tense এবং কৃদন্ত কাল বা --- নামে দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে মৌলিক কালের অন্তর্ভুক্ত হল নির্দেশক ও অনুজ্ঞাসহ সাধারণ বর্তমান এবং অনুজ্ঞা ও কৃচিৎ নির্দেশকসহ সাধারণ ভবিষ্যৎ। এগুলো সংস্কৃতের বর্তমানের দুই রূপ লট্ ও লোট্ এবং ভবিষ্যতের লৃট্ থেকে আগত। কৃদন্ত কালের অন্তর্গত হল অতীত, 'বি-' অন্ত ভবিষ্যৎ এবং নিত্যবৃত্ত কাল।

বাংলা ক্রিয়াপদের কালের তালিকাটি নিম্নরূপ—

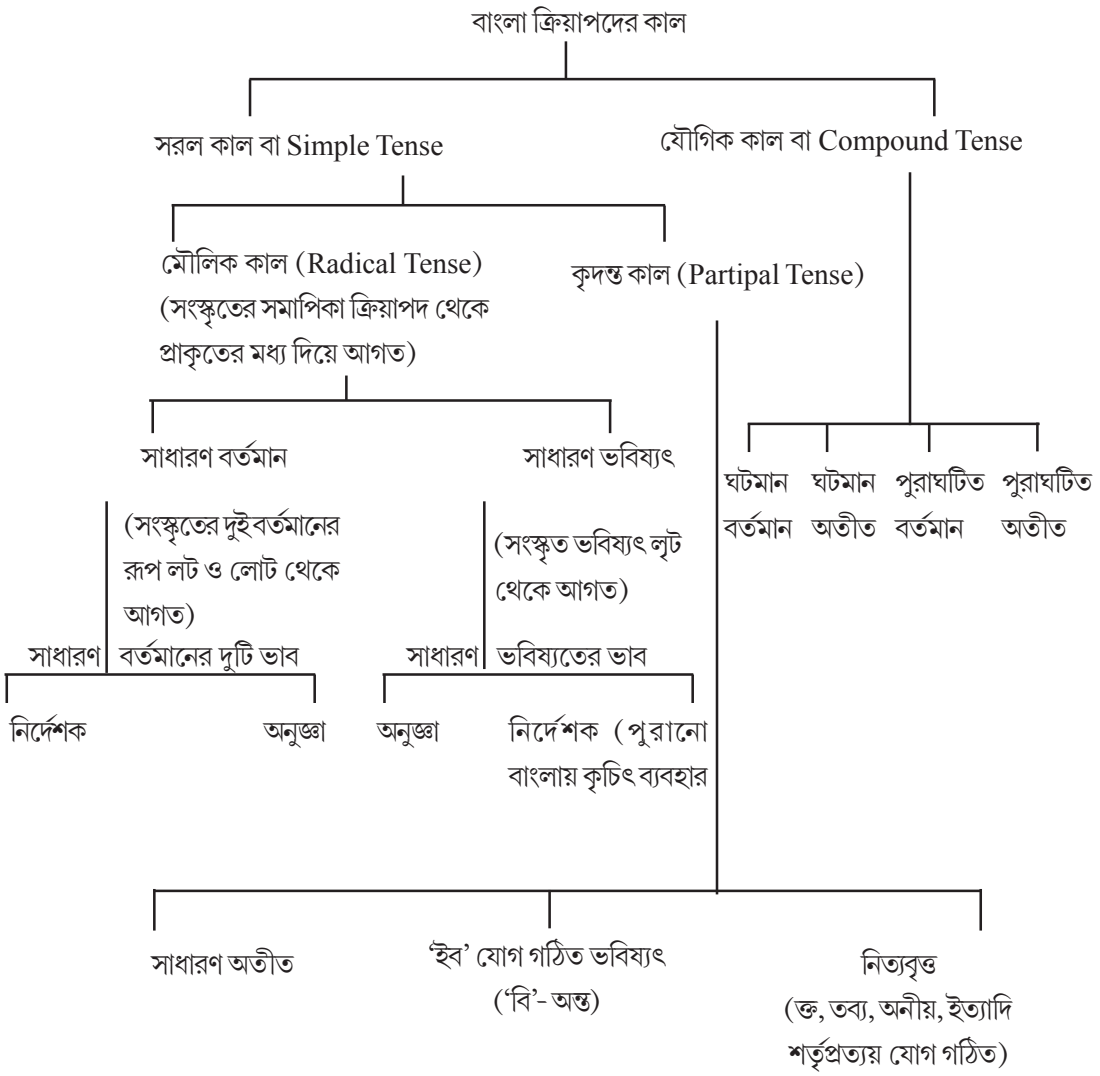

বাংলা মৌলিক কাল

বাংলা মৌলিক কালের অন্তর্গত সাধারণ বর্তমান এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল আবার নির্দেশক ও অনুজ্ঞা ভাব (Mood) ভেদে আবার চারটি উপবিভাগে বিভক্ত। এইগুলো হল নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান, অনুজ্ঞভাবে মৌলিক বর্তমান, নির্দেশকভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎ এবং অনুজ্ঞাভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎ। এইগুলোর বিবর্তনের ধারা নিম্নরূপ—

নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বা সংস্কৃতের 'লট্' থেকে নির্দেশকভাবের মৌলিক বর্তমানের পুরুষ বাচক বিভক্তিগুলো বিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে তিনটি বচনের ব্যবহার

প্রচলিত ছিল, কিন্তু বাংলায় দ্বিবচন লুপ্ত। সংস্কৃত ক্রিয়াবিভক্তির এই বিবর্তনের ধারাটিকে একটি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে —

	সংস্কৃত ক্রিয়া বিভক্তি			প্রাচীন বাংলা		মধ্য বাংলা		আধুনিক বাংলা	
	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরষ	তি	তস	অন্তি	ই	ন্তি, থি	ই	—	এ সাধারণ এন (সম্ভ্রমার্থে)	—
মধ্য পুরুষ	সি	থস	থঃ	সি	হু	সি	হ ('থ' জাত)	ইস্ (তুচ্ছার্থে) এন্ (সম্ভ্রমার্থে)	
উত্তম পুরুষ	মি	বস	মস	মি	হঁ	ওঁ,য়,ত	—	ই	—

প্রাচীন বাংলা : প্রথম পুরুষের একবচন

(ক) এরমধ্যে প্রাচীন বাংলার প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ ছিল -ই। এটি সংস্কৃত 'তি' থেকে আগত। যেমন— আছই, করই, যাই, জানই, হোই, ভনই, কহই, দেই, পইসই, দেখই, বুঝই ইত্যাদি।

(খ) প্রাচীন বাংলায় এই '-ই' বিভক্তি আবার কখনো কখনো স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে 'অ'-তে রূপান্তরিত হয়ে অবশেষে লুপ্ত হয়েছে (-অ> ০)। যেমন- সং দৃশ্যতে। প্রা. দিসসই > অব. দীসই > প্রা. বা — দীসঅ (হরিণার খুরণ দীসঅ), সং উহতি > প্রা., অব., প্রা, বাং উহই > প্রা. বা উহ; সং দয়তি > প্রা. বা দেই > দে।

(গ) প্রাচীন বাংলায় -ইঅই, -এই বিভক্তিও লক্ষ করা যায়। এটি সংস্কৃত চুরাদি বিকরণে কর্মভাব বাচ্যে (-তি, -তে) বিভক্তি থেকে উৎপন্ন ও অবহট্‌ঠ থেকে গৃহীত।

সং-য় (কর্ম-ভাব বাচ্যের বিকরণ) + তি > অপ. -অই, -এই > প্রা. বা. -অই, -এই, যেমন

সং প্রাপ্যতে, প্রাপ্যতি > প্রা., অব পাবিঅই > প্রা. বা. পায়ি অই,

সং. বন্ধাপয়তি > প্রা., অব বন্ধাবই > বন্ধাঅই > প্রা. বা. বন্ধবএ

সং. কথয়তি > প্রা., প্রা.বা কহেই

সং. কর্যতে (ক্রিয়তে) > প্রা. অপ. করিঅই > প্রা.বা. করিঅই > করেই

সং সিধ্যতে > প্রা., অব, সিজ্‌ঝই > প্রা.বা. সিজঝই, সিজ্‌ঝএ।

প্রথম পুরুষের বহুবচন

প্রাচীন বাংলার প্রথম পুরুষের বহু বচনের বিভক্তির রূপ '-ন্তি' ও 'থি'। সংস্কৃত-

'ন্তি' থেকে বাংলায় '-ন্তি' বিভক্তি আগত যেমন 'চাহন্তি, ভনন্তি', গান্তি, নাচন্তি, উন্তি। '-থি' বিভক্তি সংস্কৃত অস্তি থেকে জাত (অস্তি > -স্তি > -থি) যেমন, ভণথি, বোলথি।

মধ্য পুরুষ ঃ একবচন

প্রাচীন বাংলার মধ্যম পুরুষের একবচন বিভক্তি 'সি'। এটি সংস্কৃত 'সি' বিভক্তির প্রভাবজাত। যেমন- আচ্ছসি, পুচ্ছসি, বুঝসি। ড° সুকুমার সেন এটিকে সংস্কৃত 'অসি' থেকে প্রাকৃতের '-সি' বিভক্তির মাধ্যমে বাংলায় আগত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বহুবচন

প্রাচীন বাংলার মধ্যম পুরুষের বহু বচনের বিভক্তি '-হু'। এটি সংস্কৃত দ্বিবচনের '-থস' বিভক্তিজাত। যেমন - আছহু।

উত্তম পুরুষ

প্রাচীন বাংলায় নির্দেশক ভাবে মৌলিক বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের এক বচনের বিভক্তি '-মি', '-ম' এবং বহুবচনের '-হুঁ'।

একবচন

(ক) সংস্কৃত 'অস্মি' থেকে জাত '-মি' বিভক্তিতে সংস্কৃত 'মি' বিভক্তিটিরও প্রভাব বর্তমান। সং অস্মি > স্মি প্রা. > ম্হি > অপ, প্রা.বাং-মি, যেমন, পুছমি, জানমি, পীবমি, লেমি, মারমি, কহমি, জীবমি, পেখমি ইত্যাদি।

(খ) '-ম' বিভক্তিটি সংস্কৃত 'স্ম' ('অস্মি'র বহুবচন) থেকে প্রাকৃতের '-ম্হ' মাধ্যমে আগত। যেমন- অচ্ছম।

বহুবচন

সংস্কৃত 'অহ্ম' থেকে জাত 'হউ', 'হুঁ' বিভক্তি প্রাচীন বাংলার 'হুঁ' বিভক্তিতে পর্যবসতি। যেমন- খেলহুঁ, দেহুঁ ইত্যাদি।

মধ্য বাংলা

প্রথম পুরুষ ঃ মধ্য বাংলায় নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান কালে প্রথম পুরুষের বিভক্তি '-ই', '-য়', '-এ', '-অএ', '-ইএ', '-ন্তি', '-এন', '-এন্ত' ইত্যাদি। এরমধ্যে —

(ক) সংস্কৃত -তি, থেকে -ই, -এ আগত। সং তি > -ই, -এ, যেমন

সং দয়তি > দেই, লেই, সং যাতি > যাই > যাঅ > যায়, ইত্যাদি।

সংস্কৃত '-তি' -এর সঙ্গে পূর্ববর্তী -অ-কারের সন্ধির ফলে মধ্য বাংলার '-এ'-র উৎপত্তি। যেমন, সং চলতি > প্রা., অব. প্রা. বাং চলই > ম.বা.চলে; করে, পড়ে; সং ভবতি > প্রা. অব, প্রা.বা. হোই > ম.বা. হোএ (হএ) > হয়।

সং সুপতি > প্রা. অব, সু অই > প্রা.বা. শোত্র > ম.বা. শোত্র, শোয়।

(খ) সং -য় (কর্ম-ভাববাচ্যের বিকরণ) + '-তি' > -অএ, -ইএ

যেমন, সং চ (া) লয়তি > প্রা. অব, প্রা. বা. চালঅই > ম. বা. চলএ (চালয়ে), করত্র, বলএ, সং কর্ত্যতে > প্রা. কট্টি অই > অব, প্রা.বা. কাটি অই > ম.বা. কাটএ (কাটিয়ে), শুনীএ, থাকিএ, ধরিয়ে ইত্যাদি।

(গ) সং. বহুবচনের বিভক্তি -ন্তি > -ন্তি। যেমন, কহন্তি, করন্তি, বোলান্তি, দেন্তি ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি নাই।

মধ্যম পুরুষ

মধ্যম পুরুষের একবচনে -সি, '-অ', এবং বহুবচনে 'থ' বিভক্তি লক্ষ করা যায়।

(ক) 'সি' বিভক্তি সংস্কৃত '-সি' থেকে জাত। যেমন, চাহসি, দেসি, করসি

(খ) সং '-ত' > -অ। যেমন বল, কর ইত্যাদি

(গ) বহুবচনের -হ, -হা সংস্কৃত '-থ' বিভক্তি থেকে জাত। যেমন, - যাহ (যাহা), চলহ, করল, পালাহ, পালাহা ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষ

উত্তম পুরুষে এক বচনের বিভক্তি 'ওঁ', 'ই' (ঈ), ইএ ইত্যাদি প্রযুক্ত, বহুবচনের বিভক্তি নাই।

(ক) সংস্কৃত অহম জাত ওঁ [অহকে > হগে > হল > হোঁ > ওঁ]

যেমন — চলোঁ, সং করোমঃ> অপ. করম > প্রা.বা করবঁ> ম.বা. করওঁ, করোঁ

(খ) সংস্কৃত 'য়' (ভাব কর্মবাচ্যের বিকরণ) + তি > মধ্যবাংলায় ইএ যেমন, কর্যতে > করিত্র, সং

(গ) 'ত' (নিষ্ঠা, ভাব কর্মবাচ্যে) > ম.বা. 'ই'

যেমন, সং (আস্মাভিঃ) করিতম্ > প্রা.বা. (আম্হে) করিঅ > ম.বা. (আম্হে) করি, করী।

আধুনিক বাংলা

প্রথম পুরুষ

আধুনিক বাংলায় প্রথম পুরুষে সাধারণ অর্থে 'এ' এবং সম্ভ্রমার্থে '-এন' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। এই পর্বে কোনো পুরুষেই বচনভেদ লক্ষ করা যায় না।

(ক) -এ < ম.বা. -ই, -এ। যেমন, করে, চলে, যায় ইত্যাদি।

(খ) -(এ)ন্ < ম.বা. -(এ) ন্ত। যেমন, করেন, চলেন, যান ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ

(ক) তুচ্ছার্থে ঃ -ইস, -অস < ম.বা.সি, যেমন - চলিস, বলিস, করস ইত্যাদি

(খ) সাধারণ অর্থে ঃ -অ < ম.বা.-হ। যেমন - চল, কর, বল ইত্যাদি।

(গ) সম্ভ্রমার্থে ঃ -এন। যেমন - চলেন, বলেন, করেন ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষ

-ই < ম.বা. '-ই'। যেমন, আছি, করি, খাই, শুই, দিই ইত্যাদি। সং চলামি > চলইঁ > চলই > চলি

৮.৬ ধাতু : বৈচিত্র্য ও উৎস

বাংলায় ব্যবহৃত মোট ধাতুর সংখ্যা প্রায় ১৫০০ হলেও এদের অনেকগুলো ব্যবহারের অভাবে লোপ পেয়েছে। বাংলা ধাতুর উৎসের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, বাংলা ধাতুর কিছু সংস্কৃত থেকে আগত, অবশিষ্ট প্রাকৃত, দেশি শব্দ, নামশব্দ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ক্বচিৎ বিদেশী শব্দ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। সংস্কৃত থেকে যে ধাতুগুলি বাংলায় এসেছে, তাদের কোনো কোনোটি ক্রমবিবর্তনের ধারায় এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে মূলের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। যেমন— 'শ্রূ'>শোন্-ধাতু, 'কৃ'>'কৈ' (ঘর কৈনু বাহির), উপ+বিশ>বস্-ধাতু।

ধাতুর শ্রেণি বিভাগ :

বাংলা ভাষার ধাতুগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচার করলে সেগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

(ক) মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু।

(খ) সাধিত ধাতু।

(গ) সংযোগমূলক বা যৌগিক মূল ধাতু।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ধাতুমূল কী? (৪০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

ধাতু এবং ক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কী? (২৫ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

বিকরণ কাকে বলে? (২৫ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

(ক) মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু ঃ

যে সকল ধাতু স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ অর্থ বজায় রেখে যে ধাতুগুলির আর বিশ্লেষণ চলে না, সেই ধাতুগুলিকে বলে মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু। এটি অন্তরঙ্গ বা তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ। যেমন— তুই যা/কর্/দেখ্/বস্/ঘুর্/চল্/বল্— বস্তুত এই যা, কর্, দেখ্, বস্ ইত্যাদি প্রত্যেকটিই ধাতুমূল। উৎপত্তিক বিচারে জানা যায় বাংলায় এই সিদ্ধ ধাতুগুলি বিভিন্ন সূত্রে আগত। যেমন—

১। উপসর্গহীন সংস্কৃত ধাতু থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে আগত কিছু তদ্ভব ধাতু ঃ- আছ্, কর্, কিন্, ছাড়্, জাগ্, ধা, নে, পুছ্, বাঁচ্, ভাজ্, মিশ্, যা, শো, হ, কাঁদ্, কাঁপ্, কাট্, ভর, মাখ্, যুঝ্ ইত্যাদি। এগুলি উপসর্গহীন মূল সংস্কৃত ধাতুর বিকারে জাত।

২। উপসর্গযুক্ত সংস্কৃত ধাতু থেকে উৎপন্ন প্রাকৃত মাধ্যমে আগত বাংলা তদ্ভব ধাতু। যথা— আ (আ+√বিশ্), আইস্ বা আস্ (আ+√বিশ্— আবিশতি>আইসই>আইসে>আসে), আন্ (আ+√জ্ঞা), উয় (উদ্+√ই— উদেতি>উয়ে), উজা (উদ্+√যা), উপজ্ (উদ+√পদ—উৎপদ্যতে>উপজে), নিবা (নির+√বা), নিহার্ (নী+√ভাল্), পর্ (পরি+√ধা), পস্ বা পইস্ (প্র+√বিশ), বইস্ বা বস্ (উপ+√বিশ), সঁপ্ (সম্+√অপ) ইত্যাদি।

৩। সংস্কৃতে সাধিত ধাতু, প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু হয়েও প্রাকৃত মাধ্যমে কিছু কিছু বাংলায় সিদ্ধ ধাতুতে পরিণত হয়েছে। যেমন— কহ্ (কথা— কথয়তি>কহে), গাহ্ (গাথা—গাথয়তি>গাহে), পাড় (√পত্— পাতয়তি>পাড়ে), গাল্ (√গল্—গালয়তি), চাল্ (√চল্—চালয়তি), তার্ (√তর—তারয়তি), টান্ (√তন— তানয়তি), থো (√স্থা— স্থাপয়তি>থোয়), পা (প্র+√আপ্), বাহ্ (√বহ্—বাহয়তি), মার্ (মৃ— মারয়তি), হার্ (√হৃ—হারয়তি) ইত্যাদি।

৪। কতগুলো দেশী ও অজ্ঞাত মূল ধাতু প্রাকৃত মাধ্যমে বাংলায় এসেছে। যথা— এড়া, কোঁদা, মসা, খাটা, খুঁটা, ঘেরা, চাপা, চাওয়া, চটা, ঝোলা, ঠেলা, নড়া, ফেলা, পোঁতা, বাছা, ডুবা, ঘাঁটা, হাঁচা, বুড়া, ভাসা, কুরা, ছোঁড়া ইত্যাদি।

৫। সংস্কৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ থেকে জাত শব্দ অর্থাৎ নামধাতুকেও কখন কখন বাংলায় সিদ্ধ ধাতু রূপে ব্যবহার করা হয়। যথা— গাও-<গাহ— (গাথয়—গাথা), মোড়— (মোড়ে, মোড়ায়), জেতে— (জোতে), গাড়— (গাড়ে) [<গর্ত], ঘাম— (ঘামে) [<ঘর্ম], চেন— (চেনে) [<চিহ্ন] ইত্যাদি।

৬। প্রচুর সংখ্যক তৎসম বা অর্ধতৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতুও বাংলায় সিদ্ধ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়— কীর্ত্, গর্জ্, তিষ্ঠ্, বর্ত্, সেব্, হিংস্, ভর্ৎস্, চুম্ব্, অজ্, ধ্যা, নির্মা, ভঞ্জ, শোভ ইত্যাদি। সাহিত্যে বিশেষত কাব্যসাহিত্যের ভাষায় এগুলির ব্যবহার অধিক।

৭। কিছু কিছু বিদেশী শব্দও বাংলায় সিদ্ধ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়— আরবি— জম্, কম্ এবং ফারসি— দাগ্, ইংরেজি— পাস্ ইত্যাদি।

(খ) সাধিত ধাতু

যে সকল ধাতুর বিশ্লেষণে অপর কোনো ধাতু বা নামশব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় সাধিত ধাতু। এতদ্ভিন্ন, যেখানে সংস্কৃত ও অন্য বিশেষ্যপদ, কোনো প্রত্যয় গ্রহণ না করেও একেবারে ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়— সেরূপ নাম ধাতুকেও সাধিতধাতু বলা যায়। যথা— করা, হাতা, হাতড়া ইত্যাদি। সংস্কৃত বা তৎসম, প্রাকৃত বা তদ্ভব, দেশী বা ধ্বন্যাত্মক এবং বিদেশী সাধিত ধাতুতে এসকলেরই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে— '-আ'/'-ওয়া' প্রত্যয় যোগ করে এই জাতীয় ধাতু গঠিত হয়। অর্থ গঠনের বিচারে সাধিত ধাতুকে নিম্নোক্ত শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করা চলে—

ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু

সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে 'আ' বা 'ওয়া' প্রত্যয় যোগ করে প্রয়োজক ধাতু সাধিত হয়। সংস্কৃতে অনুরূপ ক্ষেত্রে 'নিচ্' প্রত্যয় যোগ হয় বলে এদের নিজন্ত ধাতুও বলা হয়। যেমন— কর্+আ=করা (অপরকে দিয়ে করানো), যা+ওয়া=যাওয়া, দেখ্+আ=দেখা।

কর্মবাচ্যের ধাতু

সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। শুন্—আ—শুনা, সোনা (কথাটা বাল শোনায় না); বিঁধ+আ=বিঁধা, বেঁধা (সে কান বেঁধায়), দেখ—আ—দেখা, ইত্যাদি।

অজ্ঞাতমূল 'আ' প্রত্যয়ান্ত ধাতু

গজা-নো, গুঁড়া-নো, জিরা-নো, জুড়া-নো, লেলা-নো, বিলা-নো, টাঙা-নো, হেদা-নো ইত্যাদি।

নামধাতু

সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণে '-আ' প্রত্যয় যোগ করে— লাঠি বা লাঠা— লাঠা, পাছু—পাছুআ/পেছো (পেছানো), আগু—আগুআ/এগো (এগোনো), বাহির— বাহিরা/বেরো (বেরোনো), আকুল>আউল-আউলা, আলুআ, অইলা, এলো, দুখ-দুখা, বিঘ-বিঘা, জুতা (জুতানো) ইত্যাদি।

এছাড়া কতগুলি স্বার্থিক প্রত্যয়ের সঙ্গে 'আ' যুক্ত নামধাতু—

(i) 'ক' প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য থেকে— থমক-থমকা-নো; ধমক-ধমকা-নো, হড়ক-হড়কা-নো।

(ii) 'ড়' বা 'ট' প্রত্যন্ত বিশেষ্য থেকে— আঁকড়ানো, দাবড়া-নো, আঁচড়া-নো, কচটা-নো, ঘষটা-নো।

(iii) '-ল' বা 'র' প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য থেকে— আগলা-নো, ছোবলা-নো, চোমরা-নো, ডোকরা-নো।

(iv) '-স' বা 'চ' প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য থেকে— চুপসা-নো, ঝলসা-নো, ধামসা-নো, লেঙচা-নো, ভেঙচা-নো, কপচা-নো, ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার ধ্বনিজ ধাতু

অনুকার ধ্বনির সঙ্গে- 'আ' যোগে অথবা অনুকার ধ্বনির দ্বিত্ব করে তৎসহ 'আ' যোগে সাধিত পদ সৃষ্টি হয়। যথা— বিশুদ্ধ ধাতুমূল রূপে— হাঁচা, ধুঁকা, ফুঁকা; অথবা আ-প্রত্যয়ান্ত ধাতুরূপে— চেল্লা-নো, হাঁকা-নো, অথবা 'আ' যুক্ত দ্বিধ/অভ্যস্ত ধাতুমূল রূপে— চেঁচা-নো, গোঙা-নো, কনকনা-নো, হড়হড়া-নো, চড়চড়া-নো, চুলবুলা-নো ইত্যাদি।

(গ) সংযোগ মূলক বা যৌগিক মূল ধাতু

স্বল্পাক্ষম সিদ্ধ ধাতুর স্বল্পতা বাংলা ভাষার দুর্বলতা, তাই ভাষাকে ভাব-গাঢ়করে তোলার জন্য বিশেষ্য পদের সঙ্গে কখনো বা বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ ধাতুমূল যোগ করে মনোভাব প্রকাশ করা হয়— বিশেষ্য যুক্ত এরূপ ধাতুকে যৌগিক মূল বা সংযোগমূলক ধাতু বলা হয়। সাধারণত কর্, খা, দে, পা, যা, হ প্রভৃতি ধাতুই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে মূল ভাব প্রকাশক ধাতু বর্তমান থাকা সত্ত্বেও গাম্ভীর্যের অনুরোধে প্রধানত সাধুভাষায় এরূপ ধাতু ব্যবহার করা হয়। সিদ্ধ ধাতু 'পুছ' প্রাচীন সাহিত্যেও আধুনিক কবিতায় এবং

প্রাদেশিক বাংলায় পাওয়া যায়, কিন্তু এখন শিক্ষিত সমাজে কথা-বার্তায় ও গদ্য লেখায় এর ব্যবহার নেই, সাধিত ধাতু 'সুধা' বা 'শুধা' (জিজ্ঞাসা করা অর্থে) এখন কথ্য ভাষায় কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং সাহিত্যেও প্রযুক্ত হয়, কিন্তু 'পুছ্' বা 'শুধা' উভয় স্থলেই সংযোগমূলক জিজ্ঞাসা করা সমধিক প্রচলিত। কর্ ধাতুর সঙ্গে সংস্কৃত বিশেষ্য 'জিজ্ঞাসা' যুক্ত হয়ে এর সৃষ্টি। এইরূপ দেখা স্থলে দর্শন করা, খাওয়া স্থলে আহার করা, তাকা স্থলে দৃষ্টিপাত, খা=ভোজন কর, মর্=পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হ, দে=দান্ কর, লহ্=গ্রহণ কর, ইত্যাদি। কোনো কোনো স্থলে অবশ্য যোগ্য শব্দের অভাবেই এই সংযোগমূলক ধাতুর ব্যবহার করতে হয়। যেমন— জিজ্ঞাসা করা, স্থান ত্যাগ করা, মুনাফা করা, ইত্যাদির স্বল্পাক্ষর প্রতিশব্দ নেই। প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত এমন কিছু কিছু সিদ্ধ ধাতু ছিল— এখনো কবিতায় এদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও শিষ্ট ভাষায় এদের প্রয়োগ নেই, বরং তৎস্থলে সংযোগমূলক ধাতু ব্যবহৃত হয়। যেমন— জিনি স্থলে জয় করি, পশি স্থলে প্রবেশ করি ইত্যাদি।

যথার্থ যৌগিকমূল ধাতুগুলিতে অপর কোনো 'ধাতু' শব্দ বা প্রত্যয় একেবারে মিত্তে গেছে, এমন প্রয়োগও এমন একেবারে সীমাবদ্ধ রূপেই পাওয়া যায়। সাধারণত অনুজ্ঞায়ই এর ব্যবহার সুলভ— না+পার=নার, কব+গিয়া=করগে, দেখ+এসে=দেখসে, না+হও=নহ ইত্যাদি।

যদিও একথা অনস্বীকার্য যে সংযোগমূলক ধাতুর ব্যবহারে বাক্য অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ হয়, সহজ ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যবহারের ফলে ভাষা আড়ষ্টতাপ্রাপ্ত হয়, তবু পণ্ডিতি ধরনে কথা বলার প্রবণতা পরিতৃপ্তির জন্য, কোনো কিছু ভদ্রভাবে বলার জন্য অথবা নতুন ভাবপ্রকাশের জন্য এরূপ সংযোগমূলক ধাতুর আবশ্যকতা আছে— একে সম্পূর্ণ বর্জন করা চলে না।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

সিদ্ধধাতু কাকে বলে? এর উৎপত্তির বিভিন্ন সূত্রগুলি কী কী? (২০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

সংযোগমূলক ধাতু কাকে বলে? এর প্রায়োগিক বিশেষত্ব কী? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৮.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে উপসর্গীয় প্রত্যয়, বাংলা উপসর্গ, লিঙ্গ, ক্রিয়ার কাল, ধাতু প্রভৃতির মূল বিষয়বস্তু।

৮.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। বাংলা ধাতুপ্রকরণের উৎস ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করুন।

২। বিভিন্ন উৎস থেকে আগত বাংলা ধাতু সমূহকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক প্রকারের দষ্টান্তসহ পরিচয় দিন।

৩। ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৪। লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী, বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৫। বাংলা উপসর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৬। উপসর্গীয় প্রত্যয় বলতে কী বোঝায় এবং এই ধরনের প্রত্যয় প্রয়োগ কীভাবে ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

৮.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন

২। ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস : হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৩। পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস : গৌরীনাথ শাস্ত্রী

৪। বাংলা ভাষার পরিক্রমা : পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৫। আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে : পরেশচন্দ্র মজুমদার

৬। সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার ক্রমবিকাশ : পরেশচন্দ্র মজুমদার

৭। বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৮। বাংলা ভাষা চর্চা : সুভাষ ভট্টাচার্য

৯। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও ক্রমবিকাশ : নির্মলকুমার দাস

১০। ভাষাতত্ত্ব : অতীন্দ্র মজুমদার

১১। ভাষাতত্ত্ব : নীরদা বরণ হাজরা

১২। ভাষাবিজ্ঞানের গোড়ার কথা : মোহিতকুমার রায়

* * *